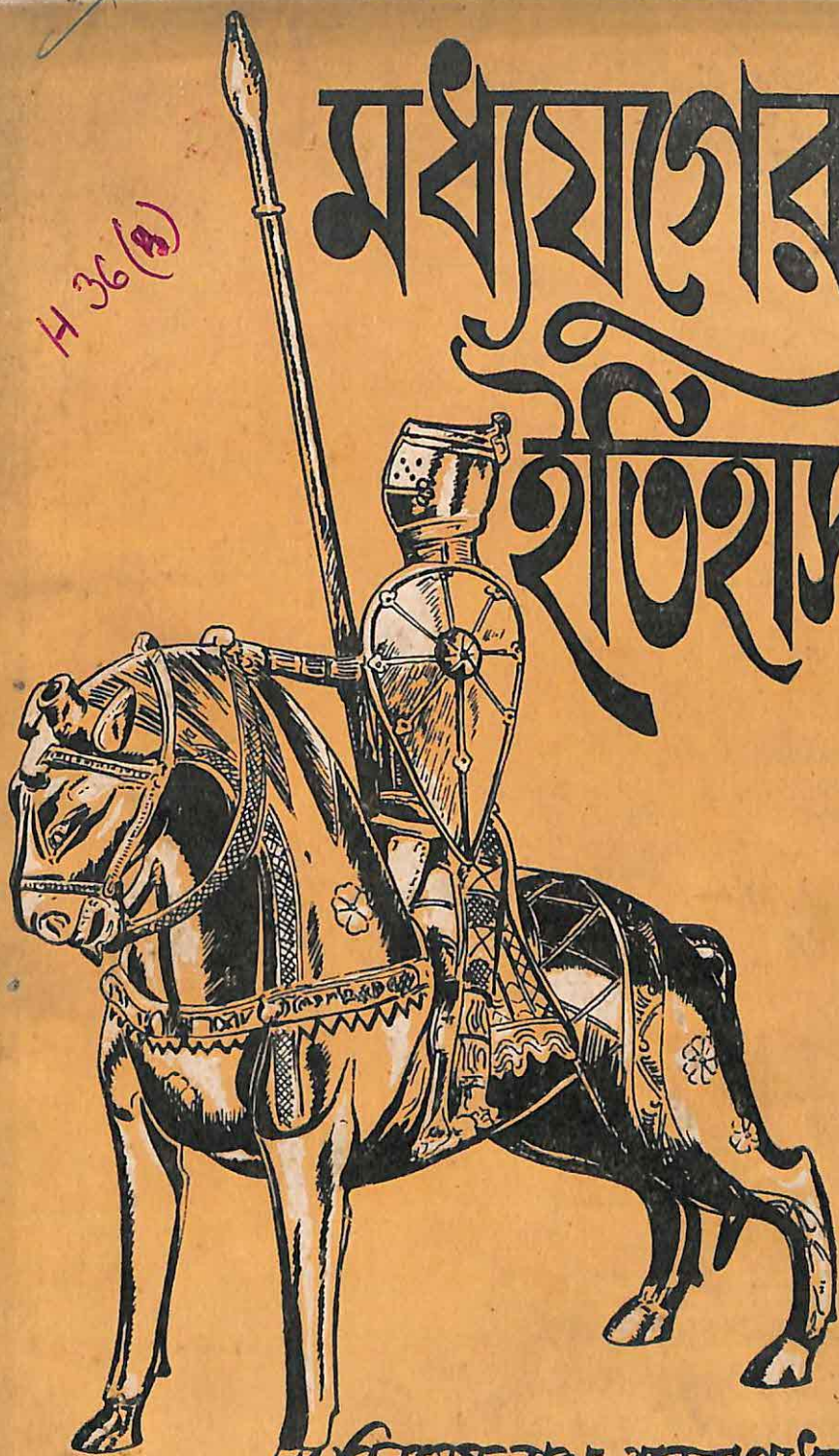
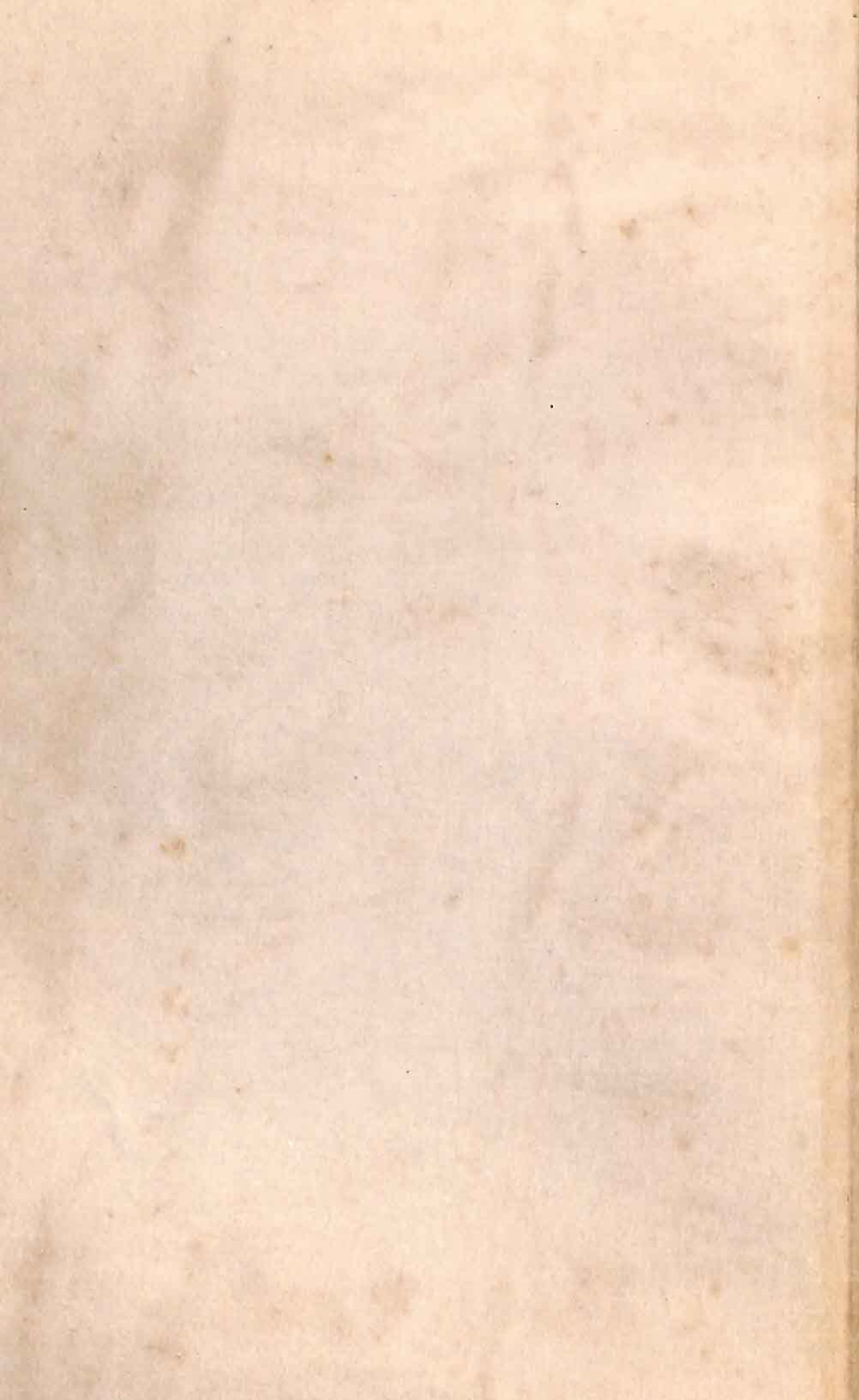


মধ্যযুগের ইতিহাস

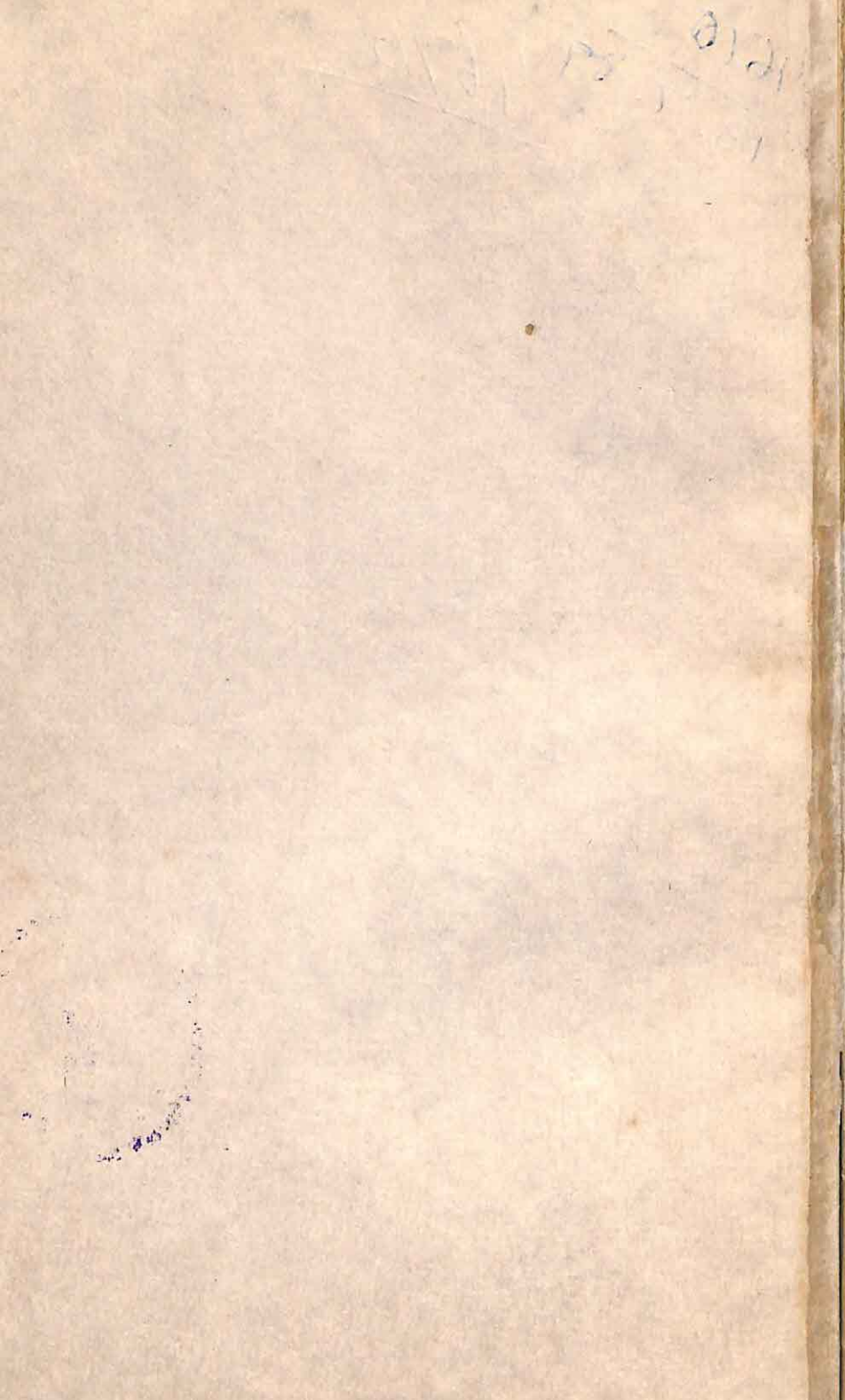


বিনোদনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

436(8)



4670
13.7.89 4670



*Recommended by the West Bengal Board of Secondary
Education as a Text Book for Class VII—Vide
Notification No. T. B. /VII/H/81/8 Dated 8. 1. 1981.*

মধ্যযুগের ইতিহাস

[দ্বিতীয় খণ্ড]

✓ [সপ্তম শ্রেণীর জন্য]

শ্রীবিনয়েন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি. এ. (অনার্স), বি. টি.
শিক্ষক, নবগ্রাম বিদ্যাপীঠ, কোল্লগর ; প্রাক্তন শিক্ষক,
দুর্গাচরণ রক্ষিত বঙ্গবিদ্যালয়, চন্দননগর ;
রাষ্ট্রবিজ্ঞান (উচ্চ মাধ্যমিক), আদিযুগের ইতিহাস
প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা ।



ইণ্ডিয়ান প্রোগ্রসিভ পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৫৭-সি, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রকাশক :

সি. ভট্টাচার্য বি. এ. ; বি. টি.

৫৭-সি, কলেজ স্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০০৭০

মহাত্মা গান্ধী

S. O. B. R. I. West Bengal.

Date 13. 7. 89

Page No. 4670

H VII
BIN

প্রথম সংস্করণ : জানুয়ারী, ১৯৮১

দ্বিতীয় সংস্করণ : মার্চ, ১৯৮১

তৃতীয় সংস্করণ : মার্চ, ১৯৮২

চতুর্থ সংস্করণ : ডিসেম্বর, ১৯৮৩

মূল্য : তেরো টাকা মাত্র।

মুদ্রাকর :

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ধন

স্ববোধ প্রেস

৬, ডালিমতলা লেন

কলিকাতা-৭০০০০৬

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

মাত্র ষেড় বৎসরের ভেতর মধ্যযুগের ইতিহাসের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করতে হচ্ছে, এজন্য আমি পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছে কৃতজ্ঞ। তাঁরা যে আমার বইটি সপ্তমশ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে উপযোগী বলে বিবেচনা করে এর সমাদর করেছেন, তাতেই আমার সমস্ত শ্রম সার্থক হয়েছে।

এই সংস্করণে শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার জন্যে কয়েকটি অধ্যায়ের শেষে দেওয়া অল্পশীলনীতে কিছু সংক্ষিপ্ত ও নৈব্যক্তিক প্রশ্ন যোগ করা হয়েছে। এ ছাড়া, বইয়ের শেষে আরও দুইটি পরিশিষ্ট—রোমান সম্রাটদের তালিকা আর সম্রাট শার্লমেনের বংশাবলী যোগ করা হয়েছে। এগুলো ছাত্রছাত্রীদের কৌতুহল মেটাতে সাহায্য করবে আশা করি।

বিনীত

প্রমুখকার

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক পর্ষৎ ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য ইতিহাসের যে নতুন পাঠ্যক্রম প্রবর্তন করেছেন তার স্বাভাবিক অন্তর্ভুক্তি হিসেবেই মধ্যযুগের ইতিহাসকে সপ্তম শ্রেণীর পাঠ্যক্রম হিসাবে নির্বাচন করেছেন। আগেকার উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাক্রমেও অনুরূপ পাঠ্যক্রম প্রচলিত ছিল। ইতিহাস মানবজাতির সমাজ-জীবনের ক্রমবিকাশের বস্তুনিষ্ঠ এবং ধারাবাহিক বিবরণ। সেই উপলব্ধি কিশোর মনে জাগিয়ে তোলবার লক্ষ্যেই মানব ইতিহাসের এক সামগ্রিক রূপের সঙ্গে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের পরিচিত করা দরকার—ইতিহাস-পাঠের সবচেয়ে বড়ো গুরুত্ব এখানেই। শিক্ষার্থীর আচরণকে সমাজ-জীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয় যোগ্যতালাভের উপযুক্ত করে তুলতে হলে তার চেতনায় সমাজবোধ বিকশিত করে তোলা দরকার, তার মনে জানবার আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টির জন্য তার কৌতুহল প্রবৃত্তিকে উদ্দীপ্ত করা দরকার। মানবসমাজের সামগ্রিক ইতিহাসের ধারাবাহিক কাহিনী এই উদ্দেশ্যপূর্তির পক্ষে সবচেয়ে বেশি সহায়ক। তাই পৃথিবীর প্রায় সবদেশেই মাধ্যমিক স্তরের ইতিহাসের পাঠ্যক্রমে বিশ্ব-ইতিহাসের রূপরেখাকেই সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়ে থাকে।

আমাদের দেশে ইংরেজ শাসনকালে ইতিহাস পাঠের ওপর বড় একটা গুরুত্ব আরোপ করা হত না। অষ্টম শ্রেণীর পর থেকে ইতিহাস ছিল ঐচ্ছিক বিষয়। সে সময় অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ইতিহাসের পাঠ্যক্রম ছিল শুধুমাত্র ভারত-বর্ষের ইতিহাস। তাই আমাদের স্বাভাবিক সংস্কার এই যে, অল্পবয়সী

ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে ইতিহাসের অন্য কোন পাঠক্রম অবশ্যই খুব কঠিন হবে। কিন্তু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আমি দেখেছি যে, ভারতের ইতিহাসের মত পৃথিবীর ইতিহাসও কিশোর শিক্ষার্থীদের কাছে সমান কোতূহল ও আগ্রহের বিষয় হয়ে ওঠে।

সপ্তম শ্রেণীর জন্য মধ্যশিক্ষা পর্যন্ত যে পাঠক্রম নির্দিষ্ট করেছেন তাতে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিশ্ব ইতিহাসের মূল গতি-ধারাটিকে সংক্ষেপে পরিবেশন করার নির্দেশ রয়েছে। স্বভাবতঃই এর ভেতর পৃথিবীর কিছু কিছু অঞ্চলের ঐতিহাসিক বিকাশধারার বিবরণকে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে, যাতে পাঠ্য বিষয় অতিরিক্ত ভারাক্রান্ত হয়ে না পড়ে। দৃষ্টান্ত হিসাবে ইংল্যান্ডের, রাশিয়ার ও মধ্য-এশিয়ার মধ্যযুগীয় ইতিহাসের অনুরণনের কথা বলা যেতে পারে। মনে হয় যে এরকমটা না হলেই বোধ হয় ভালো হত।

তবু একথা নির্দিষ্ট বলা চলে যে, মানব-ইতিহাসের মধ্যযুগীয় বিকাশ-ধারার যে অঞ্চল, সংক্ষিপ্ত পরিচয় পর্যন্ত-রচিত পাঠক্রমের ভেতর দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে, তাকে অনুসরণ করে লেখা ইতিহাস কিশোর ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা ও জ্ঞান বিকাশের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হবে।

এই বইখানা এ কাজে কতদূর সার্থক হয়েছে তার বিচারের ভার শিক্ষক-শিক্ষিকাদের। বই তাঁদের পছন্দ হলে, ছাত্র-ছাত্রীদের ভালো লাগলে আমার প্রশ্রয় সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো। আমি মধ্যযুগের ইতিহাসের মূল ধারাটিকে যথাসম্ভব সহজ ও চলিত ভাষায় লিখেছি, যাতে ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে বুঝিতে সুবিধে হয়। বইয়ের পরিশিষ্টে মধ্যযুগের একটি সংক্ষিপ্ত কালপঞ্জী সংযোজিত হয়েছে। এর সাহায্যে ছাত্র-ছাত্রীদের 'ঐতিহাসিক সময়-রেখা' অঁকা শেখানোর সুবিধে হবে বলে আমার বিশ্বাস।

অধ্যক্ষ শ্রীস্বধাংশুশেখর ভট্টাচার্য মহাশয়ের উৎসাহ, উত্থোগ আর পরিপূর্ণ সহযোগিতার ফলেই বইটির প্রকাশ সম্ভব হয়েছে। তাঁর সহায়তার জন্তে আমি তাঁর কাছে একান্ত ঋণী,—তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা আমার জানা নেই। শ্রীবিশ্বনাথ মজুমদার, শ্রীনিরঞ্জন ভট্টাচার্য এ বই প্রকাশে আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন, শ্রীকণী সাহা পুস্তকের প্রচ্ছদ ও অন্যান্য চিত্র এঁকে দিয়ে আমাকে উপকৃত করেছেন। এঁদের সাহায্য-সহযোগিতার জন্তে তাই জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

বিনীত

গ্রন্থকার

Syllabus

[Pica Type, Size—Double Demy 1/16. Maximum 110 pages of content matter and 34 pages of illustrations and exercises : Total—114 Pages.]

Class VII : History of Medieval Civilizations

(1) Meaning of the term "Medieval" :

(a) From overthrow of the last Roman Emperor, in 476 A.D. to the rise of new society, new state, new learning, new economic patterns.

(b) In India—from the end of Gupta Era (although 'Feudal' relations had started from the 5th century).

(c) The time period in both cases—roughly 5th century to 15th century A.D.

(d) Periodisation is arbitrary because of gradual transition, in some respects the old merging into the middle ages.

(e) Middle ages—not the same period everywhere.

(f) No Single pattern. Unequal and varied developments.

1) The Middle Ages in the West :

(a) Advent pressure of the Huns upon Germanic Tribes—their migration into the western part of the Roman Empire (476 A.D.)—Survival of Roman Law and Roman idea of Imperial unity.

(b) A short reference to Alaric, Atilla, Gaeseric.

(c) Social, political and religious life of the migrants (a brief account only of) their settlements in the imperial territories—mix-up with Roman population—Christian influence upon the settlers. [3 pages]

(3) The myth of "dark age" in Europe :

4th to 7th Century—not 'dark' ; learning was kept alive in monasteries—ecclesiastical concept of right and wrong functioned as a civilising influence. [3 pages]

(4) The Byzantine Civilization :

(a) Constantine founds Constantinople and makes Christianity the official religion of Byzantium.

(b) Justinian's efforts to establish unified empire (without details about wars)—Justinian's Law Code, its importance—patronage of architecture and painting.

(c) Importance of Byzantium as a centre of trade and commerce—preserver of culture (Literature, Philosophy, Science). [7 pages]

(5) Islam and its impact :

The Arabs—land and people—the Prophet and his teachings—factors which facilitated the spread of Islam—the Caliphs, the Arab Empire—Cordova—how Europe reacted to the achievements of Islam—Arab contributions to culture, arts and science, scholarship—some scholars.

[7 pages]

(6) Western Europe in Medieval period (800-1200 A.D. approx) :

(a) Charlemagne—revival of the Holy Roman Empire (800 A.D.)—importance of coronation—relation between state and church—court and its patronage of art and literature.

(b) Monasteries—monks and nuns—life centering round monasteries (Benedictine vows)—the role of monasteries in the preservation and dissemination of learning—Cluny (Freeing the Church from corruption, secularisation and feudalisation).

(c) Investiture issue (Reference only).

(d) 11th and 12th centuries : from monastic and cathedral schools, Universities—some famous scholars, students and teacher relationship—the growth of studies in Law, Medicine, Theology and Logic, Liberal Arts, Literature.

[10 pages]

(7) Feudalism in Medieval Europe :

(a) Feudalism : Land—the bond between man and man—the feudal hierarchy—private assumption of public authority—the role of the Feudal Castle and mailed horsemen in saving Europe—Feudalism—a way of life—Institution of Chivalry—Troubadours.

(p) Manorial System—Manorialism—economic aspect of Feudalism—Manor—the local unit of Feudal Govt.—Manorial Court—Economic conditions—cultivation by labour of village community—peasants' heavy toil and heavy rent—conditions of Peasants' life—heavy dues to Lord and Church in cash or kind—Manorial life in castles—three distinct classes—clergy nobility and the rest—nobility and peasants at opposite poles—Serf, a chattel of the Lord—obligatory service—hereditary serfdom—means of escape—joining a holy order—running away to town for shelter—getting employed in business and industry—revolt.

[16 pages]

(8) The Crusades (1st, 3rd and 4th)

(a) Motives—impact upon society and culture—new

towns and trade centres (Italy in particular)—cottage industries separated from agriculture (11th and 12th centuries).

(b) Growth of towns—role of the Crusades—Guilds in towns—their activities—a short account of life in towns—town autonomy by royal charter—origin of the term “Bourgeois.” [6 pages]

(9) The Far East in the Middle Ages :

(i) China in Medieval Period (from early 7th Century to 14th Century).

(a) The T'ang Period (618-907 A.D.)—Re-unification of China and recasting the laws—education, learning, literature (poetry)—tea, printing, arts—promotion of trade, commerce and agriculture—Buddhism in China—Chinese civilization spreads to Japan, Korea, Annam—China—a model for emulation—Hiuen Tsang's visit to India and his return—impact.

(b) The Sung Period (960-1280)—important experiments—state control of commerce—state loan to farmers—Property Tax—education and culture.

(c) The Yuan Period (1280-1368)—the Mongals—Kublai Khan (Tibetan Buddhism)—the account of Marco Polo.

[10 pages]

(10) Japan in Medieval Period.

(a) Society and Feudal economy in early medieval times—Supremacy of Mikado—close links with China—resistance of “Great Families”—Mikado combined the office of Shinto High Priest and absolute sovereign—the growing power of hereditary clan families and enrichment of Buddhist Orders weakened the central authority—The Shogunate—The Samurai—Japanese Chivalry (Bushido).

[6 pages]

(11) India in the Middle Ages :

(a) After the Guptas (5th-7th Century)—Hun incursions from 458 A.D.—occupation of Persia, Kabul, North-western India—historical importance—break up of the Gupta Empire—age of Harshavardhan—shrinking of the ideal of imperial unity to only Uttarprathanath—Hiuen Tsang's travels—his account—Nalanda—main features of the University.

(b) Post-Harshavardhan Period (8th to 12th Century)—After Harshavardhan—rise of smaller states—the Rajputs—the Feudal-clanish principalities of Rajputana—Pala, Pratihar, Rastrakuta—contest (reference only)—inability to establish a united empire—smaller kingdoms and vassals.

(c) Bengal—Sasanka—life and society under the Palas and Senas—religion and learning—(Vikramshila and Uddandapur.)

(d) South India—The Chalukyas of Badami and Pahlavas of Kanchi—their contributions to Art and Architecture—maritime activities of the Cholas. [16 pages]

(12) Indian's foreign contacts :

By land—Mahayana Buddhism in Central Asia—then to China (Khotan ruins. Hiuen Tsang's evidence)—Tibet (Atisa Dipankar)—By sea—settlements and cultural influence in South-East Asia—Subarnabhumi—Yashodharpur and Angkorvat. Angkortham—Malay—Java—Barobudur. [7 pages]

(13) The Sultans of Delhi (1206 to 1526 A.D.) :

Coming of Turko-Afghans to India only a brief reference to the motive and manner of their coming)—main features political, social and economic life—mutual influence of Hinduism and Islam—liberal developments in Arts and Culture—translation of Classics—Bhakti Cult (the medieval saints,—Sri Chaitanya, Nanak and Kabir Bengal—social cultural and economic conditions in Ilias Shah and Hussain Shah's periods—short account of the general administrative system. [6 pages]

(14) Towards the end of the Medieval Era (14th and 15th Centuries) :

Fall of Constantinople—its impact on the Renaissance which had already started in the West.

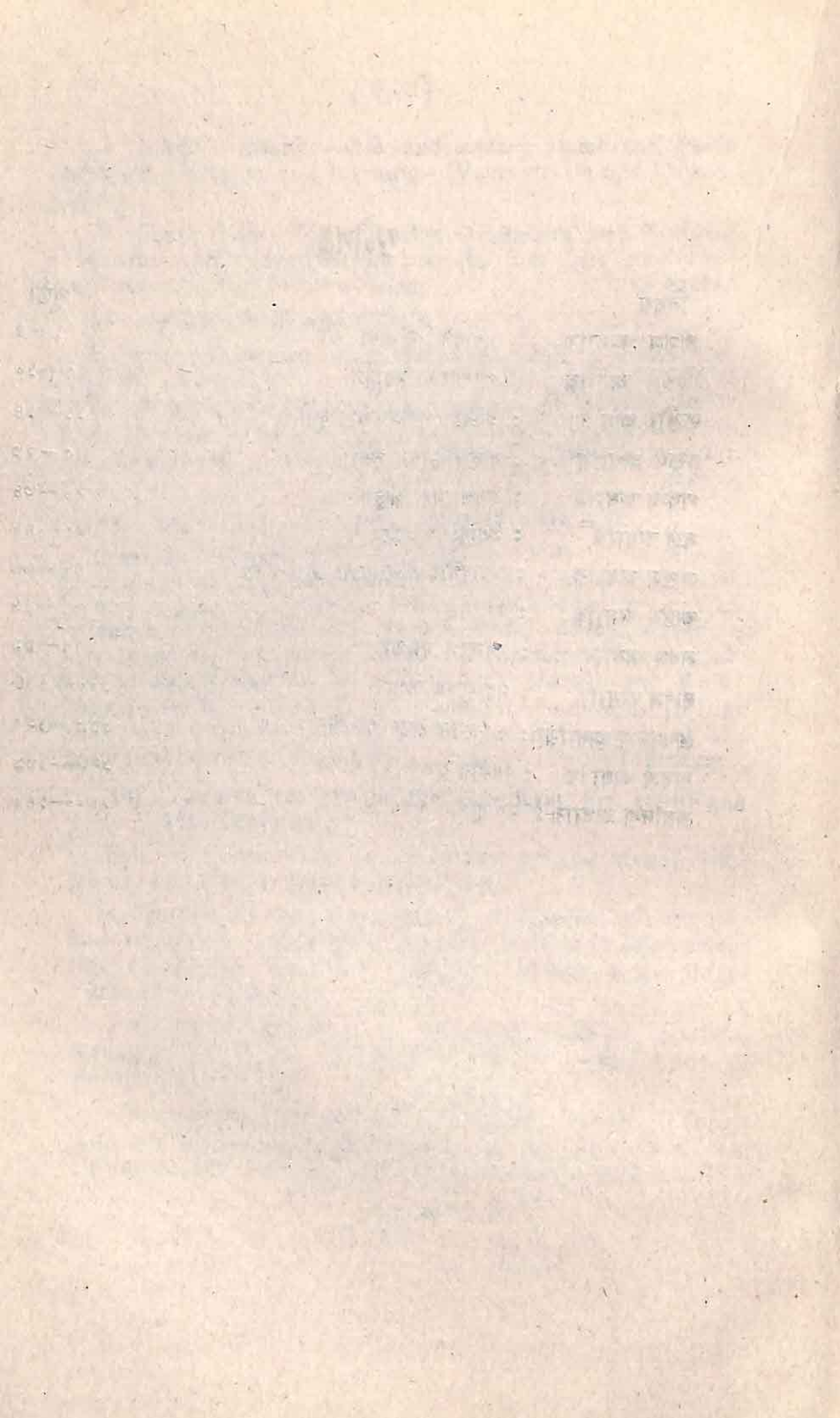
* Features of the Renaissance Era—spirit of enquiry and reasoning widening of frontiers of Knowledge—scientific discoveries based on "observed facts"—geographical discoveries—its outcome.

* National States—France, England, Portugal, Spain—Struggle for National Freedom (Dutch)—Expansion of Europe.

Old order vs. New order—The English revolt. [Topics with asteriks should only be used as reference as a conclusion to the old era and introduction of a new era.]

মুচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	: মধ্যযুগ কি এবং কেন	১—৪
দ্বিতীয় অধ্যায়	: পাশ্চাত্যে মধ্যযুগ	৫—১০
তৃতীয় অধ্যায়	: ইউরোপে 'অন্ধকার যুগ'	১১—১৪
চতুর্থ অধ্যায়	: বাইজাণ্টাইন সভ্যতা	১৫—২৩
পঞ্চম অধ্যায়	: ইসলামের অভ্যুদয়	২৪—৩৪
ষষ্ঠ অধ্যায়	: মধ্যযুগের ইউরোপ	৩৫—৪৭
সপ্তম অধ্যায়	: মধ্যযুগীয় ইউরোপের সামন্ততন্ত্র	৪৮—৬৬
অষ্টম অধ্যায়	: ক্রুসেড	৬৭—৭৬
নবম অধ্যায়	: মধ্যযুগে দূরপ্রাচ্য	৭৭—৯৯
দশম অধ্যায়	: মধ্যযুগের ভারত	১০০—১১৮
একাদশ অধ্যায়	: ভারতের বৈদেশিক উপনিবেশ	১১৯—১২৭
দ্বাদশ অধ্যায়	: দিল্লীর সুলতানী শাসন	১২৮—১৩৯
ত্রয়োদশ অধ্যায়	: মধ্যযুগের অবসানে	১৪০—১৪৫



মধ্যযুগের ইতিহাস

প্রথম অধ্যায়

মধ্যযুগ কি এবং কেন

[বিষয়বস্তু-সংক্ষেপ : খ্রীষ্টীয় পঞ্চম থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীকে মানব-ইতিহাসে মধ্যযুগ বলে চিহ্নিত করা হয়। এই সময়ের মধ্যে পৃথিবীর নানা দেশের সমাজ, সংস্কৃতি রাষ্ট্রব্যবস্থা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় নূতন ধারার বিকাশ ঘটেছিল বলে সভ্য পৃথিবীর সমাজবিকাশের ক্ষেত্রে নূতনত্ব দেখা দেয়, তাই এ সময়কাল মধ্যযুগ বলে ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে থাকে। অবশ্য, সমাজ-সভ্যতার বিকাশধারায় পরিবর্তন পৃথিবীর সব জায়গায় ঠিক একই সময় বা ঠিক একই চেহারা নিয়ে দেখা দেয় নি।]

ইতিহাস মানব-সভ্যতার ক্রমবিকাশের কাহিনী। মানুষের জন্মের সঙ্গে এর শুরু, আর সভ্যতা-সংস্কৃতিতে মানুষ যতই এগুতে থাকে ইতিহাসের কাহিনীও ততই এগুতে থাকে।

মানুষ যে সময়টা থাকে ছোট্ট এতটুকু বাচ্চা, তখন সে হাঁটতে পারে না, সে কথা বলতে পারে না,—সে নিতান্ত পরনির্ভর। আস্তে আস্তে তার মুখে কথা ফোটে, সে বসতে শেখে, হামা দেয়, দাঁড়াতে আরম্ভ করে, তারপর টলি-টলি পা-পা করে শুরু হয় তার হাঁটবার অভিযান। তার বড় হওয়ার দিন হয় শুরু।

মানব-সমাজের ক্রমবিকাশের ইতিহাসও এননি করেই শুরু হয়েছিল আজ থেকে প্রায় পোনেরো-বিশ লাখ বছর আগে। সে-ও প্রথম পৃথিবীতে এসেছিল নিতান্ত অসহায় হয়ে। তারপর সে বড় হয়েছে, অর্থাৎ এগিয়েছে দল বেঁধে। প্রত্যেক মানুষের গোটা জীবনকে যেমন শৈশব, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ় আর বার্ধক্য এই কয়ভাগে ভাগ করা হয়, মানব-সমাজের দল বেঁধে বড় হওয়ার জীবনধারাকেও

তেমনি ভাগ করবার দরকার হয় ইতিহাস রচনার জন্তে। শৈশব থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত একজন মানুষের দেহে-মনে যে পরিবর্তন হয় তা

মানব-সমাজের

ইতিহাসকে

বিভিন্ন যুগে

ভাগ করা হয় কেন

বোঝাবার জন্তেই আমরা একজন মানুষের গোটা

জীবনকে যেমন ভাগ করি শৈশব থেকে বার্ধক্য

পর্যন্ত নানা স্তর বা শ্রেণীতে, মানব-সমাজের বিকাশ-

ধারার কাহিনী, অর্থাৎ ইতিহাসকে ভাগ করার

প্রয়োজন হয় মানবজাতির দেহে-মনে, অর্থাৎ

সমাজ-গঠনে, জীবনযাত্রা-নির্বাহে আর জ্ঞানবুদ্ধির বিকাশে ক্রমাগত

যে পরিবর্তন ঘটে চলেছে তার পৃথিবীতে জন্মাবার পর থেকে,—

সেটাকে ঠিকমতো বোঝাবার জন্তে। এইজন্তই মানুষের ইতিহাসকে

ভাগ করা হয় আদিযুগ, মধ্যযুগ, আধুনিক যুগে। মানব-সভ্যতার

বিকাশের সময় থেকে অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় দশ হাজার বছর

আগে যীশুখ্রীষ্টের জন্মের পাঁচশো বছর পর্যন্ত সময়কালকে বলা

হয় আদিযুগ। তারপর থেকে খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী অর্থাৎ

খ্রীষ্টজন্মের পর প্রায় ১৫০০ বছর পর্যন্ত সময়কালকে বলা হয়

মধ্যযুগ, আর এর পর থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত সময়কে বলা

হয় আধুনিক যুগ। আমরা মধ্যযুগের কথা আলোচনা করছি এই

ইতিহাসে।

ইউরোপে রোমান সাম্রাজ্যের পতনের সময় থেকেই (৪৭৬ খ্রীঃ)

মধ্যযুগের শুরু বলে ধরে নেওয়া হয়। এই সময় থেকেই মধ্যযুগ

অরিস্ত হয়েছে বলে ধরে নেওয়া কতটা সঠিক হয়েছে তা নিয়ে

মতবিরোধ আছে। মধ্যযুগের সমাপ্তিকাল নিয়েও

নানা মত আছে। কেউ কেউ মনে করেন যে

বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের বা প্রাচ্য রোমান

সাম্রাজ্যের পতন (১৪৫৩ খ্রীঃ) পর্যন্ত মধ্যযুগের সীমা, তারপরেই

আধুনিক যুগের শুরু। আবার কেউ কেউ মনে করেন যে কলম্বাসের

আমেরিকা আবিষ্কারের সময় (১৪৯২ খ্রীঃ) পর্যন্ত মধ্যযুগের সীমা

নির্দিষ্ট হওয়া উচিত। যা হোক, পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে মোটামুটি একমত

মধ্যযুগ কি এবং

কেন

যে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত মধ্যযুগের সীমা।

‘মধ্যযুগ’ শব্দটা সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন সপ্তদশ শতাব্দীর মানবতাবাদী ইতিহাস লেখকেরা। তাঁরা মনে করতেন যে তাঁদের সময়েই আবার নূতন করে বিজ্ঞান-চর্চা আর প্রাচীন যুগের শিল্প-সংস্কৃতি-সাহিত্যকে জানার-বোঝার চেষ্টা শুরু হয়েছে। তাই তাঁরা প্রাচীন যুগ আর নবজাগৃতির ‘মধ্যযুগ’ নাম কি করে এলো।

যুগের মধ্যবর্তী সময়কে ‘মধ্যযুগ’ বলে চিহ্নিত করেন। তাঁরা এই যুগকে বর্বর জাতিগোষ্ঠীর বিজয় অভিযানের ফলে অজ্ঞতা, কুসংস্কার আর ব্যাপক সাংস্কৃতিক অবনতির যুগ বলে অভিহিত করেছেন।

কিন্তু মানুষের সভ্যতার ইতিহাস তো পিছিয়ে যাওয়ার ইতিহাস নয়, মানুষ ক্রমাগত এগিয়েই চলেছে, আর এই অগ্রগতির পথে পুরোনো ধ্যান-ধারণা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সংস্কৃতি-সাহিত্য প্রভৃতি নূতন চেহারায়া দেখা দিচ্ছে। ফলে চলেছে এক মস্ত ভাঙ্গাগড়া, আর এই ভাঙ্গাগড়ার ভেতর দিয়েই নূতন যুগের আবির্ভাব হয়। তাই প্রাচীন যুগের পরবর্তী স্তরে অতীতের সমস্ত সুন্দর আর মধ্যযুগের সঠিক পরিচয় মহৎ সৃষ্টি লোপ পেয়ে গেল, নূতন কিছু গড়ে উঠলো না তা হয় না এবং হয়ও নি। আসলে

প্রাচীন যুগের সমাজ, রাষ্ট্র জ্ঞানচর্চা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল এর পরের যুগে। তাই একে মধ্যযুগ বলে পরিচয় দেওয়া হয়। এই যুগে সমাজ-ব্যবস্থার এক নূতন রূপ দেখা দেয়, এই রূপ হল সামন্ত-ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থা প্রাচীন যুগের ব্যবস্থার তুলনায় নূতন। এই নূতন ব্যবস্থাকে ঘিরেই গড়ে উঠলো নূতন সমাজজীবন, তার সংস্কৃতি, ধর্ম, রাষ্ট্র,—শুরু হল মধ্যযুগ।

ভারতেও মধ্যযুগের শুরু সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগ থেকে, যখন গুপ্ত যুগের অবসানের পর ভারতজোড়া ‘একরাট’ সাম্রাজ্য ভেঙ্গে নানা ছোট রাজ্য উঠেছে জেগে। এই সময় থেকে ভারতে

তুর্ক-আফগান জাতিগোষ্ঠীর শাসনকাল পর্যন্ত (৫১৮-১৫২৬ খ্রীঃ)

সময়কে মধ্যযুগের অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে।

ভারতে মধ্যযুগ ভারতে সামন্ত শাসন গুপ্তযুগেই শুরু হলেও তা আরও সম্প্রসারিত আর শক্তিশালী হয় এই সময়ে। সঙ্গে সঙ্গে ভারতের সমাজ-সংস্কৃতিতে নূতন ধারার বিকাশ ঘটে।

মানব-সভ্যতার প্রাচীন যুগের বিকাশধারা পৃথিবীর সব অঞ্চলে প্রায় একই পথে অগ্রসর হয়েছিল। কৃষি-নির্ভর গোষ্ঠীজীবন থেকে ব্যাপক ও বিশাল নগর সভ্যতার বিকাশ হল প্রাচীন সভ্যতার ভিত্তি। ঠিক তেমনি যাযাবর বর্বর জাতিগোষ্ঠীর আক্রমণে নগর-

সভ্যতা পরিবর্তিত হয়ে সাম্রাজ্য-ভিত্তিক সমাজধারার রূপ নিয়েছিল। সে সামাজিক সমৃদ্ধির মূলে ছিল বিকাশের বৈচিত্র্য

সামরিক অভিযান, বিদেশের সম্পদ ও জনশক্তির লুণ্ঠন। কিন্তু মধ্যযুগে বিকাশধারায় এমন সামগ্রিক মিল বা ঐক্য অনুপস্থিত। ইউরোপে মধ্যযুগের সূত্রপাত হল যাযাবর অর্ধ-বর্বর জাতিগোষ্ঠী কর্তৃক রোম সাম্রাজ্য ধ্বংসের ভেতর দিয়ে। এশিয়ার হুণদের এক শাখার ইউরোপ অভিযান এই ধ্বংসলীলায় গতিবেগ সঞ্চার করে। কিন্তু এশিয়ায়, বিশেষ করে ভারতে মধ্যযুগ এলা দীর্ঘগতি ক্রমিক পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে। প্রাচীন সভ্যতা-সংস্কৃতির কাঠামোর মধ্যেই এই পরিবর্তন ঘটলো ক্রমে ক্রমে। তাই বলা যেতে পারে যে, প্রাচীন যুগের মতো মধ্যযুগে কোন ছনিয়া-জোড়া অভিন্ন কাঠামো দেখা দেয় নি।

অনুশীলনী

১। ‘মধ্যযুগ’ কাকে বলে? কারা প্রথম এই কথাটি ব্যবহার করেন? ‘মধ্যযুগ’ বলে আলাদা এক কালপর্ব চিহ্নিত করা হয় কেন?

২। প্রাচীন যুগের সঙ্গে মধ্যযুগের মূল প্রভেদ কোথায়? মধ্যযুগে সভ্যতার উন্নতি ঘটেছিল মনে করা হয় কেন?

দ্বিতীয় অধ্যায়

পাশ্চাত্যে অধ্যায়

[বিধায়ক-সংক্ষেপ : হুণ আক্রমণের ফলে জার্মান জাতিগোষ্ঠীগুলি নিজেদের বাসভূমি ত্যাগ করে রোম সাম্রাজ্যের পশ্চিমভাগে এসে বসবাস করতে আরম্ভ করে। ক্রমে এদের নেতারা রোম সাম্রাজ্যের নানা অঞ্চলে স্বাধীন রাজ্য গড়ে তুলতে থাকে, ইতালীর নানা অঞ্চল ও অবশেষে রোম নগরী এরা লুণ্ঠন করে এবং শেষ পর্যন্ত ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে রোম সম্রাট রোমুলাস অগাস্টুলাসকে সিংহাসনচ্যুত করে সম্রাটের জার্মান সৈন্তের নায়ক অডোয়াকার রোমের শাসক হয়ে বসলে পশ্চিমের রোম সাম্রাজ্যের সম্পূর্ণ অবসান হয়। কিন্তু ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৫২৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইতালী অধিকার করে যে সব জাতিগোষ্ঠীর নেতা রাজত্ব করেছে, তারা সবাই নিজেদের প্রাচ্য রোম সাম্রাজ্যের প্রতিনিধি বলেই পরিচয় দিয়েছে এবং লাতিন ভাষা রোমান আইন মথাসম্ভব বজায় রেখেছে]

ইউরোপের রোমান সাম্রাজ্য চতুর্থ শতাব্দীতেও আকৃতিতে মস্ত বড়ো ছিল। কিন্তু এই সাম্রাজ্যের ভিত্তিতে ফাটল ধরেছিল তখন থেকেই। যে ক্রীতদাস ব্যবস্থা রোমান অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার বনিয়াদ

ছিল, তা তখন প্রায় অকোজো হয়ে পড়েছিল।
 রোমান সাম্রাজ্যের প্রয়োজনীয় অর্থসংগ্রহের জন্য ইতালীর অত্যাচার
 দুর্বলতা

অধিবাসীদের ওপর আর ইউরোপীয় রোমান সাম্রাজ্যে বসবাসকারী গথ ও জার্মানদের ওপর নানাভাবে জুলুম করা হত। ফলে রোমের সম্রাট আর অভিজাতদের বিরুদ্ধে সারা ইউরোপের সাধারণ মানুষের হুণা আর বিদ্রোহ ভীষণভাবে বেড়ে উঠেছিল।

এমন সময় মোঙ্গল জাতীয় এক 'যাযাবর' বর্বর উপজাতি মধ্য এশিয়া থেকে ইউরোপে প্রবেশ করে। এরা পৃথিবীর ইতিহাসে হুণ নামে পরিচিত। কৃষ্ণসাগরের তীর ধরে পশুচারণ ক্ষেত্রের সন্ধানে এরা ক্রমাগত পশ্চিমদিকে এগুতে থাকে আর এই অঞ্চলে বসবাসকারী অস্ট্রোগথদের (পূর্বদেশের গথ) নিজেদের বাসভূমি বর্ধনদের অল্পপ্রবেশ থেকে উচ্ছেদ করতে থাকে। অস্ট্রোগথেরা পশ্চিমের গথ, অর্থাৎ ভিসিগথদের তাড়িয়ে তাদের বাসভূমি দখল করে নেয়।

ফলে তারা রোম সম্রাট ভ্যালেন্স-এর অহুমতি নিয়ে দানিযুব নদীর পশ্চিম তীরে রোমান সাম্রাজ্যের ভেতর দিয়ে এসে বসবাস আরম্ভ করে।

রোমান সাম্রাজ্যের পূর্ব সীমান্তের এই অঞ্চলে বসবাসকারী ভিসিগথদের উপর আঞ্চলিক শাসক আর সেনানায়কের অত্যাচার ও জুলুমের ফলে ৩৭৭ খ্রীষ্টাব্দে গথেরা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এবং এই ভিসিগথদের সমস্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। রোম সম্রাট ভ্যালেন্স স্বয়ং এই বিদ্রোহ দমন করতে এসে পরাজিত ও নিহত হন। পরবর্তী রোমান সম্রাট থিওডোসিয়াস সাময়িকভাবে এদের দমন করলেও পঞ্চম শতাব্দীতে এ্যালারিক-এর নেতৃত্বে ভিসিগথেরা রোম নগরী লুণ্ঠন করে।

ইতিমধ্যে হুণরাজ এ্যাটিলার শাসনাধীন বর্বর উপজাতিগুলো দানিযুব নদীর পূর্বতীরে সংঘবদ্ধ হয়ে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ৪৩৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৪৫৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এ্যাটিলার হুণ-বাহিনী রাইন নদের পূর্বতীর থেকে উরাল পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় নিজেদের আধিপত্য অব্যাহত রেখেছিল। বাইজান্টাইন সম্রাটের কাছ থেকেও এ্যাটিলার রাজস্ব আদায় করতো। ৪৫১ খ্রীষ্টাব্দে এ্যাটিলার গল অভিযান রোমান ও বর্বরদের সম্মিলিত বাহিনীর প্রতিরোধে ব্যর্থ হলে এ্যাটিলারাইনের পরপারে সরে যায় কিন্তু পরের বছর আবার সে উত্তর ইতালী আক্রমণ করে এবং এ্যাকুইনিয়া, পাভিয়া ও মিলান অধিকার করে। রোম সম্রাট তৃতীয় ভ্যালেন্টিনিয়ান রোম নগরীতে আশ্রয় নেন, তারপর এ্যাটিলার সঙ্গে সন্ধির প্রস্তাব করেন। রোমের ক্যাথলিক খ্রীষ্টানদের প্রধান ধর্মযাজক পোপ প্রথম লিওর মারফত এ্যাটিলাকে এক বিপুল পরিমাণ অর্থ দেবার পর এ্যাটিলা ইতালী থেকে নিজের সৈন্যসামন্ত নিয়ে রাইনের পরপারে নিজের রাজ্যে ফিরে যায়। ৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে এ্যাটিলার মৃত্যু হলে হুণেরা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং পশ্চিম

ইউরোপের জনজীবন থেকে হুণ-আতঙ্ক চিরকালের জন্য দূর হয়ে যায়। এ্যাটলাকে 'ইউরোপের বিভীষিকা', 'ঈশ্বরের অভিশাপ' প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হত।

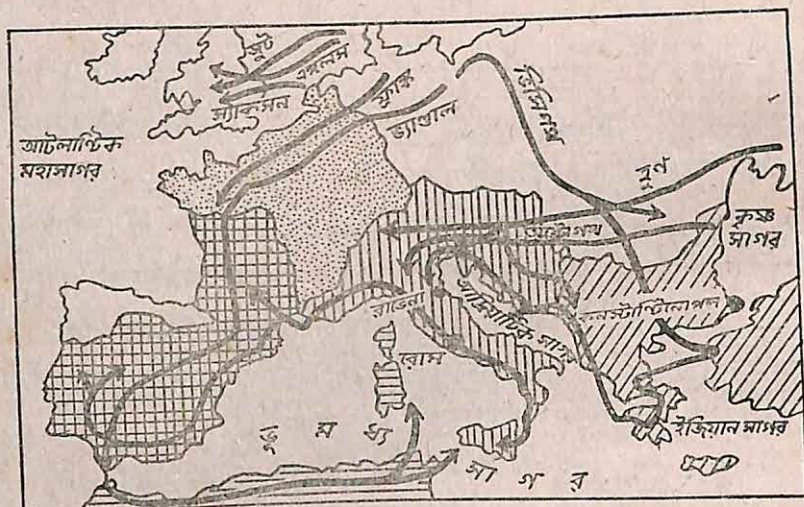
বর্বরদের ক্রমাগত আক্রমণের ফলে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য প্রকৃতপক্ষেই ভেঙে পড়েছিল। সমস্ত ইতালী বর্বরদের অভিযানের ফলে বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল, রোমের আড়ম্বর-ঐশ্বর্য সমস্তই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। অবশেষে, ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ভাড়াটে রোমের পতন জার্মানবাহিনীর সেনাপতি অডোয়াকার শেষ

সম্রাট রোমুলাস অগাস্তুলাসকে সিংহাসনচ্যুত করে নিজেকে প্রাচ্য রোমান সম্রাটের প্রতিনিধি বলে ঘোষণা করে, ফলে ইউরোপের রোমান সাম্রাজ্যের শেষ অস্তিত্বটুকুও লোপ পায়।

৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দে অষ্ট্রোগথ উপজাতির নেতা থিওডোরিক অডোয়াকারকে ইতালী থেকে তাড়িয়ে দিয়ে সমগ্র ইতালীতে নিজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর ছত্রিশ বছর ধরে থিওডোরিক ইতালী শাসন করেন এবং প্রভেন্স, দক্ষিণ জার্মানী, বর্বর শাসনে ইতালী : হাঙ্গেরীর কিছু অংশ দখল করে রাজ্যসীমা থিয়োডোরিক সম্প্রসারিত করেন। স্পেনের উপরেও তাঁর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইতালীর র্যাভেনা নগরীতে তিনি তাঁর রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন।

রাজা থিওডোরিক জাতিতে জার্মান হলেও কার্যতঃ ইতালীর রোমান প্রভুই থেকে যান। রাজ্যের শাসনকার্যে, বর্বর রাজত্ব ও রাজসভার কাজকর্মে সবসময়ে লাতিন ভাষাই রোমান আইনের ব্যবহৃত হত, রোমান সেনেটকে তিনি সম্মান শাসন করতেন। রোমান আইন বা রোমান শাসন-ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন তিনি করেন নি। তিনি নিজেকে প্রাচ্য রোমান সম্রাটের প্রতিনিধি বলে পরিচিত করতেন, তাই তাঁর রাজ্যের আইন প্রণয়ন, মুদ্রা প্রচলন সমস্তই করা হত রোমান সম্রাটের নামে। নিজের রাজ্যকে তিনি রোমান সাম্রাজ্যের অংশ বলেই ভাবতেন।

সুতরাং বলা যেতে পারে যে বর্বর জার্মানরা ক্ষমতার অধিকারী হয়ে রোমান সভ্যতা ও সংস্কৃতি অনুকরণের চেষ্টা করে।



বর্বর উপজাতির অভিযান পথ ও রাজসীমা

■ আটলান্টিক মহাসাগর ■ জার্মানিক সাগর ■ উত্তর সাগর ■ কৃষ্ণ সাগর ■ ইন্ডিয়ান সাগর
 ■ জার্মানিক ভূমি ■ কেল্টিক ভূমি ■ রোমান সাম্রাজ্য ■ অন্যান্য ভূমি
 বর্বরদের অভিযান পথ →

রোমান সাম্রাজ্যের উত্তর ও পূর্ব দিকে, অর্থাৎ মধ্য ও পূর্ব ইউরোপে অনেকগুলো বর্বর উপজাতি বাস করতো, তাদের মধ্যে প্রধান ছিল জার্মান আর কেল্টিক উপজাতি। কেল্টরা ছিল পশ্চিম ইউরোপের অধিবাসী, আর জার্মানরা ছিল মধ্য ইউরোপের।

ক্রমে জার্মানরা কেল্টদের হটিয়ে সারা পশ্চিম ইউরোপে আর ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে বসতি স্থাপন করে। এদের সমাজব্যবস্থা ছিল পিতৃতান্ত্রিক, আর এরা নানা উপজাতিতে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক উপজাতি ছিল কতকগুলো গোষ্ঠীর সমষ্টি। জুলিয়াস সিজার খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে এদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনযাত্রার সুন্দর বিবরণ লিখে রেখে গিয়েছেন। এই গোষ্ঠীর প্রধানেরা মিলিত হয়ে তাদের একজন নেতা নির্বাচিত করতো। এই নেতাই উপজাতির রাজা হতেন।

এই উপজাতিগুলো ছিল প্রকৃতি-পূজক। নানা প্রাকৃতিক শক্তিকে দেবতারূপে কল্পনা করে এরা তাদের পূজা করতো। ক্রমে, আনুমানিক খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী থেকে এদের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম ছড়িয়ে পড়তে আরম্ভ করে। রোমান সাম্রাজ্যে অভিযান আরম্ভ করার সময় এইসব বর্বর জাতি-উপজাতির অধিকাংশই খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়ে নিজেদের পৈতৃক ধর্ম প্রকৃতি-পূজা পরিত্যাগ করেছিল।

রোমের পতনের পর বর্বর উপজাতিরা পশ্চিম ইউরোপের রোমান অঞ্চলে এবং ইতালীতে কয়েকটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। ইতালী এবং সিসিলিতে অস্ট্রোগথদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ইউরোপে বর্বর উপনিবেশ ভিসিগথরা, স্পেন এবং বর্তমান ফ্রান্সের একাংশে রাজত্ব করতে থাকে। গলদেশের অধিকাংশ স্থানে ফ্রাঙ্ক উপজাতি আধিপত্য বিস্তার করে, আর উত্তর আফ্রিকা ও পশ্চিম ভূমধ্যসাগরের দ্বীপগুলোতে ভ্যান্ডাল উপজাতি নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। এ্যাঙ্গলস, স্যাক্সন, জুট প্রভৃতি উপজাতি ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে।

বর্বর উপজাতিরা রোমান সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাস করতে এসে রোমান সমাজ-সভ্যতা-সংস্কৃতির সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেবার চেষ্টা করতে থাকে। তাদের সর্দাররা রোমান আইন, রোমান সামাজিক রীতি-নীতি, লাতিন ভাষা প্রভৃতির প্রতি খুব শ্রদ্ধাশীল ছিল বলে এসব ব্যবস্থা অপরিবর্তিত রেখেই দেশশাসন করতে থাকে।

বর্বর উপজাতির লোকেরা ক্রমে সাধারণ রোমান নাগরিকদের সঙ্গে মিশে যেতে আরম্ভ করে, তাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হতে থাকে এবং খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষিত হবার ফলে তাদের ভেতরকার যুদ্ধপ্রীতি, হিংসাপ্রবণতা ক্রমশঃ কমে আসে। আবার সঙ্গে সঙ্গে বর্বর উপজাতিগুলোর ভেতর ক্রীতদাস-প্রথার প্রাধান্যের অভাব, দাসদের প্রতি মানবিক আচরণের রীতি, যৌথ পারিবারিক জীবন-

সাম্রাজ্য প্রতি আনুগত্য রোমান নাগরিকদের মানসিকতায় পরিবর্তন ঘটায়। ফলে রোমান সাম্রাজ্যে এক নূতন ধরনের সমাজ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে।

অনুশীলনী

১। রোমান সাম্রাজ্যের বর্বর জাতিদের অনুপ্রবেশের কারণ কি? কেন এরা রোমান শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে?

২। 'এ্যালারিক' কে? তিনি কত খ্রীষ্টাব্দে রোম নগরী লুণ্ঠ করেন? 'ভিসিগথ' 'অস্ট্রোগথ' ও 'ভ্যাঙাল' কাদের বলা হয়? এরা রোম সাম্রাজ্যের কোন্ কোন্ অঞ্চল অধিকার করেছিল?

৩। পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতন হয় কত খ্রীষ্টাব্দে? পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের শেষ সম্রাট কে? কে তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করে?

৪। বর্বর উপজাতিগুলোর সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৫। রোমান নাগরিকদের সঙ্গে বর্বর জাতিগুলোর মেলামেশোর ফলাফল বর্ণনা কর।

৬। শূন্যস্থান পূর্ণ কর:—

(১) মোদল জাতীয় এক যাযাবর উপজাতিকে—বলে।

(২) রোম সম্রাট—জার্মান উপজাতি—রোম সাম্রাজ্যের পূর্ব সীমান্তে বসবাসের অনুমতি দেন।

(৩) —আক্রমণের ফলে—উপজাতিগুলো—সাম্রাজ্যে অনুপ্রবেশ করে।

(৪) ভিসিগথদের নেতা ছিলেন—আর অস্ট্রোগথদের নেতা—।

(৫) —খ্রীষ্টাব্দে রোমান সম্রাট রোমুলাস অগাথলাস তাঁর ভাড়াটে—বাহিনীর সেনাপতি—কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হন।

৭। বন্ধনীর মধ্য থেকে সঠিক তারিখটি বেছে লেখ:—

(ক) রোমের বিরুদ্ধে গথেরা কোন্ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্রোহ করে? (৩৭৭/৩৬৭)

(খ) কোন্ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমী রোম সাম্রাজ্যের পতন হয়? (৪৭৬/৭৬৪)

(গ) কোন্ খ্রীষ্টাব্দে এ্যাটিলার মৃত্যু হয়? (৪৫১/৪৫৩)

(ঘ) কোন্ খ্রীষ্টাব্দে অডোয়াকার ইতালী থেকে বিতাড়িত হয়?

তৃতীয় অধ্যায়

ইউরোপে ‘অন্ধকার যুগ’

[বিষয়বস্তু সংক্ষেপ : সপ্তদশ শতাব্দীর ইউরোপীয় ঐতিহাসিকরা মধ্যযুগকে ‘অন্ধকার যুগ’ বলে চিহ্নিত করেছেন। কারণ এ যুগে ইউরোপে প্রাচীন গ্রীক-রোমান জ্ঞান-বিজ্ঞান শিল্প-সংস্কৃতি চর্চার ধারা লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক জীবনযাত্রায় বিরাট অবনতি ঘটেছিল। কিন্তু এই ধারণা পুরোপুরি ঠিক নয়। খ্রীষ্টান গির্জা ও মঠগুলি জ্ঞান-বিজ্ঞান-সংস্কৃতি-চর্চার ধারাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল, নূতন নূতন জ্ঞানের ক্ষেত্রে পদক্ষেপ করছিল, সাধারণ মানুষের জন্য গড়ে তুলছিল নূতন নীতি এবং জীবনবোধ।]

খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পূর্ব সীমান্তের বর্বর উপজাতিগুলো হুণ আক্রমণের ফলে দেশতাগ করে রোমান সাম্রাজ্যসীমার ভেতরে এসে বসবাস করতে আরম্ভ করার পর থেকে পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত পশ্চিম ইউরোপ জুড়ে হানাহানি ও ধ্বংসের তাণ্ডব দেখা দেয়। তার ফলে কেবল যে

রোমান সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছিল তাই নয়, প্রাচীন অন্ধকার যুগ গ্রীক-রোমান সভ্যতা-সংস্কৃতির রূপরেখা পর্যন্ত লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল বলা যায়। সপ্তদশ শতাব্দীর কিছু কিছু ঐতিহাসিক তাই এ যুগকে অন্ধকার যুগ বলে চিহ্নিত করে থাকেন। তাঁদের মতে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী হল ইউরোপের অন্ধকার যুগ।

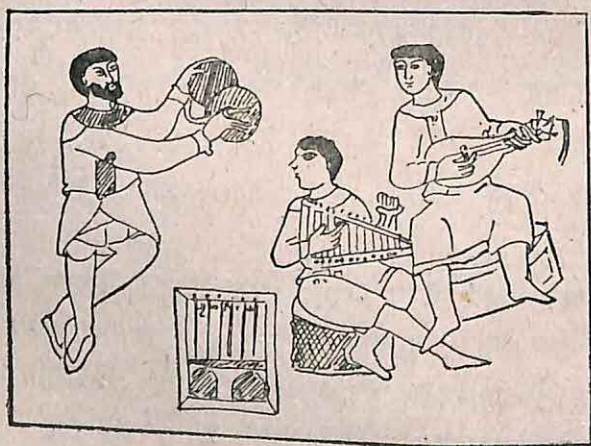
এই সময় বর্বর উপজাতিদের শতাব্দীব্যাপী রক্তাক্ত অভিযান, রোমের পতন আর পশ্চিম রোমের সাম্রাজ্যের বিলুপ্তির ফলে ইউরোপের পশ্চিম অঞ্চলে শিল্প-সংস্কৃতি-জ্ঞান চর্চা, ব্যবসা-বাণিজ্য সমস্ত নষ্ট হয়ে যায়। রোমে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা, সঙ্গীত, শিল্পকলা, ভাস্কর্যের যে সব বিখ্যাত কেন্দ্র ছিল তাদের অস্তিত্ব লোপ পেয়ে যায়।

জার্মানরা ছিল অন্ধ এবং সভ্যজগতের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার

সঙ্গে অপরিচিত। যুদ্ধ আর কৃষিকার্য অথবা পশুপালন ছাড়া অন্য কোন কাজকর্মের সঙ্গে তাদের পরিচয় ছিল না। কেন বলা হয় জার্মান রাজারা, সামন্ত সর্দাররা নিরক্ষর ছিলেন বলে সমাজে লেখাপড়া শেখার বা পড়াশোনার চর্চা লোপ পেয়ে যায়। তাই এ যুগকে অন্ধকার যুগ বলা হয়।

ইউরোপে রোমান শাসনের অবসান ও জার্মান উপজাতিগুলোর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার এই যুগের যে ছবি ওপরের বর্ণনায় তুলে ধরা হয়েছে তা সপ্তদশ শতাব্দীর ঐতিহাসিকদের বর্ণনা থেকে নেওয়া। এটা পুরোপুরি সঠিক নয়। একথা সত্য যে জার্মান আধিপত্যের প্রথম ছয়-সাতশো বছর ধরে ইউরোপে সভ্যতা-সংস্কৃতির অবনতি হয়েছিল। রোমকে কেন্দ্র করে যেমন এক শিক্ষা-সংস্কৃতি-শিল্পজগৎ গড়ে উঠেছিল আগেকার যুগে, জার্মান উপজাতিদের কোন রাজ্যের রাজধানীতেই তার প্রকাশ ঘটেনি।

কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিল্প-সংস্কৃতির চর্চা তখনও ইউরোপে অব্যাহত ছিল খ্রীষ্টান যাজক সম্প্রদায়ের চেষ্টায়। রোমের পতনের পর অল্প



মঠে সংগীত চর্চা

কিছুকালের জন্য (প্রায় অর্ধ-শতাব্দী) যাজক সম্প্রদায়ের মঠগুলোতে নানা বিশুদ্ধতা দেখা দিলেও ক্যাথলিক খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের ধর্মযাজক

সেন্ট বেনেডিক্ট-এর চেষ্টা এবং উত্থোগে মঠবাসী যাজক সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার পরিবর্তন হয়। তিনি মঠবাসী যাজকদের জন্ম যে নিয়ম-বিধির প্রবর্তন করেন তাকে অনুসরণ করে ইউরোপের ক্যাথলিক খ্রীষ্টান যাজকেরা মঠগুলোকে জ্ঞান-বিজ্ঞান-সংস্কৃতি-চর্চার কেন্দ্র করে তোলেন। গ্রীক দর্শন, বিজ্ঞান, চিত্রকলা, সঙ্গীত ও ভাস্কর্যের অনুশীলনের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টীয় মঠগুলো প্রাচীন সভ্যতা-সংস্কৃতির ধারাকে বাঁচিয়ে রাখা ও নূতন জ্ঞানের ক্ষেত্র আবিষ্কার করার মহান কর্তব্য পালন করে রাজনৈতিক অস্থিরতার অন্ধকার থেকে মধ্যযুগকে রক্ষা করেছে। এইজন্মই সেন্ট বেনেডিক্টকে একজন পোপ (ক্যাথলিক খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মযাজক) 'ইউরোপের পিতা' বলে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন।

শুধু তাই নয়, এই সব মঠে সন্ন্যাসীদের জন্ম বিদ্যা-শিক্ষার ব্যবস্থা করা হত। সেখানে অক্ষর পরিচয় থেকে আরম্ভ করে শাস্ত্র, দর্শন, সঙ্গীত, শিল্পকলা প্রভৃতির পাঠও দেওয়া হত। উপরের ছুটি ছবিতে তাই দেখানো হয়েছে। এই ছবি দুটি সেন্ট বেনেডিক্ট-এর রচিত



মঠে পাণ্ডুলিপি লিখন

মঠবাসীদের জন্ম আবশ্যকীয় নিয়মবিধি' নামক পুস্তিকার একখানি পাণ্ডুলিপি থেকে নেওয়া হয়েছে।

এইসব মঠের বিদ্যালয়ে ক্রমে বাইরের শিশুদের, অর্থাৎ বাহ্যিক

মঠবাসী সন্ন্যাসী হবে না এমন সব ছেলেদেরও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়। পরবর্তিকালে এগুলোই ইউরোপের নানা শিক্ষাকেন্দ্র, নানা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম দেয়।

এইসব মঠবাসী সন্ন্যাসীরা ইউরোপের জনসাধারণের মধ্যে, রাজা, রাজপরিবার এবং অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মোপদেশ বিতরণের ভেতর দিয়ে পারস্পরিক সহিষ্ণুতা, সততা, সত্যনিষ্ঠা, সম্প্রীতির নীতি উপদেশ দিয়ে বর্বর সমাজ-জীবনের শৃঙ্খলাহীন মানসিকতাকে সভ্যতার আলোয় ভরে দেন। এইভাবেই প্রাচীন সভ্যতার সঙ্গে নূতন জীবন-ধারণার যোগসূত্র রচিত হয় সে যুগে। তাই মধ্যযুগকে অন্ধকার যুগ বলে চিহ্নিত করা নিতান্তই অপপ্রচার ছাড়া আর কিছু নয়।

অনুশীলনী

১। ‘অন্ধকার যুগ’ কোথায় কোন্ সময়ে দেখা দিয়েছিল বলা হয়ে থাকে? কারা ‘অন্ধকার যুগ’-এর তত্ত্ব প্রচার করেন?

২। ইউরোপে মধ্যযুগকে ‘অন্ধকার যুগ’ বলা হয়েছে কেন? তুমি এই ধারণা সমর্থন কর কিনা যুক্তি দিয়ে বোঝাও।

৩। “ইউরোপের পিতা” কাকে বলা হয়েছে? কেন তাঁকে এমন মর্যাদা দেওয়া হয়েছে বুঝিয়ে দাও।

৪। একটিমাত্র শব্দ লিখে উত্তর দাও:—

(ক) কোন শতাব্দীর ইউরোপীয় ঐতিহাসিকেরা মধ্যযুগকে ‘অন্ধকার যুগ’ বলেছেন?

(খ) কাকে ‘ইউরোপের পিতা’ বলা হয়েছে?

(গ) ‘মঠবাসীদের জ্ঞান আবশ্যকীয় নিয়মবিধি’ কার রচনা?

(ঘ) প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ধারা কারা রক্ষা করেছিল?

(ঙ) পূর্ব সীমান্তের বর্বর উপজাতিরা কাদের আক্রমণে দেশছাড়া হয়?

(চ) জার্মান উপজাতি-সদাররা লেখাপড়া জানতো কি?

(ছ) মধ্যযুগে কোথায় লেখাপড়ার চর্চা হত?

(জ) মধ্যযুগ কি সত্যিই অন্ধকার যুগ?

চতুর্থ অধ্যায়

বাইজান্টাইন সভ্যতা

[বিষয়বস্তু সংক্ষেপ : রোমান সম্রাট কন্সট্যান্টাইনকে বাইজান্টাইন, সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়ে থাকে, কারণ তিনিই ৩৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই মে কৃষ্ণসাগর তীরের বস্ফোরাস প্রণালীর মুখে রোমান সাম্রাজ্যের নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। তাঁর নাম অনুসারে এই রাজধানীর নামকরণ হয় কন্সটান্টিনোপল। এখানে আগে বাইজান্টিয়াম নামে গ্রীকদের এক প্রাচীন শহর ছিল। তাই এই অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত রোমান সাম্রাজ্যকে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য বলা হয়। ৩৯৫ খ্রীষ্টাব্দে রোম সম্রাট থিওডোসিয়াসের মৃত্যুর পর রোমান সাম্রাজ্য দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়। পশ্চিম ইউরোপ আর উত্তর আফ্রিকার পশ্চিম অঞ্চল নিয়ে গড়ে ওঠে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য, আর বাইজান্টিয়াম, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, মেসোপটেমিয়া, মিশর প্রভৃতি পশ্চিম এশিয়া ও উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার দেশগুলো নিয়ে গড়ে ওঠে প্রাচ্য রোমান সাম্রাজ্য বা বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য। ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতন ঘটলেও বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করেছিল।]

রোম সম্রাট ডায়োক্লেটিয়ান সর্বপ্রথম রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী রোম থেকে সরিয়ে নিয়ে যান এশিয়া মাইনরে। পরবর্তী রোমান সম্রাট কন্সট্যান্টাইন (৩১২ খ্রীষ্টাব্দ) ডায়োক্লেটিয়ানের নীতি অনুসরণ করে পশ্চিম এশিয়ায় নূতন রাজধানী স্থাপনের সিদ্ধান্ত করেন এবং ৩৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই মে কৃষ্ণসাগর এবং আজভ সাগরের সংযোগকারী বস্ফোরাস প্রণালীর ওপর কৃষ্ণসাগরের তীরে নূতন রাজধানী প্রতিষ্ঠার কাজ শেষ করেন। এই নূতন রোম :
কন্সটান্টিনোপল রোম গড়ে তুলতে প্রায় ছয় বছর সময় লেগেছিল।
তাঁর নাম অনুসারে এই নূতন রাজধানীর নামকরণ করা হয় কন্সটান্টিনোপল। রাজপ্রাসাদ, বড় বড় অটালিকা, বিচারশালা সাধারণ স্নানাগার প্রভৃতি শোভিত এ নগরী প্রতিষ্ঠার জন্য সম্রাট কন্সট্যান্টাইন সারা রোমান সাম্রাজ্য উজাড় করে নানা সম্পদ এখানে এনে জড়ো করেন।

কনস্ট্যান্টাইন সাহস, চতুরতা ও বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে রোমের সিংহাসনের অন্ত্য দাবিদারদের পরাজিত করে।
 কনস্ট্যান্টাইন : ৩১২ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে অক্টোবর রোম নগরীতে
 সিংহাসন প্রবেশ করেন এবং রোমের নাগরিক ও সিনেট
 অধিকার সদস্যগণ তাঁকে রোমের সম্রাট বলে স্বীকার করে
 নেন। ৩২৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রাচ্য রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট
 লিসিনিয়াসের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে বিজয়ী হন। এইভাবে
 তিনি সমগ্র রোমান সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট হন এবং চব্বিশ বছর
 সমগ্র রোমান সাম্রাজ্যের শাসন পরিচালনা করেন।

সমগ্র রোমান সাম্রাজ্যকে একীকৃত করা এবং প্রাচীন গ্রীক নগরী
 বাইজান্টিয়ামের পুনঃপ্রতিষ্ঠা
 কনস্ট্যান্টাইনের এক বড় কৃতিত্ব।
 কিন্তু যে কাজের জন্য তিনি
 মধ্যযুগের ইতিহাসে সবচেয়ে
 বেশি বিখ্যাত হয়ে আছেন তা
 হল খ্রীষ্টধর্মকে রোমান সাম্রাজ্যে
 রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি বা অনুমোদন
 প্রদান। কনস্ট্যান্টাইন এক
 রাজকীয় ঘোষণায় খ্রীষ্টধর্মকে



কনস্ট্যান্টাইন-এর মূর্তি আঁকত মুদ্রা

রোমে প্রচলিত অন্যান্য ধর্মমতের সমান মর্যাদা দেন। এই ঘোষণাপত্র
 'মিলান বিধি' নামে পরিচিত। এই ঘোষণার ফলে খ্রীষ্টধর্ম রোমান
 সাম্রাজ্যে বৈধ বলে স্বীকৃতি পায়। পরবর্তিকালে
 কৃতিত্ব : ইটরোপে খ্রীষ্টান ধর্মযাজকদের করভার থেকে অব্যাহতি
 প্রদত্ত প্রতীতি দেওয়া হয়, গির্জাকে সরকারী অর্থসাহায্য দেওয়া
 হয়, গির্জাগুলোকে সম্পত্তি ক্রয় ও ভোগের অধিকার দেওয়া হয়
 এবং রবিবার দিনটি সৈন্যবাহিনীর জন্য ছুটির দিন বলে ঘোষিত হয়।
 এ ছাড়া সম্রাট কনস্ট্যান্টাইন ও তাঁর পরিবারের লোকেরা
 সাম্রাজ্যের সব জায়গায় গির্জা তৈরির জন্য উদার হস্তে দান করেন।

ফলে রোমান সাম্রাজ্যে খ্রীষ্টধর্ম দ্রুত বিস্তার লাভ করে। তাঁর নির্দেশেই বাইজান্টাইন অঞ্চলে, বিশেষতঃ কনস্টান্টিনোপ্লে খ্রীষ্টধর্মকেই রাজকীয় ধর্মের মর্যাদা প্রদান করা হয়। ফলে কনস্টান্টিনোপ্লে গ্রীক বা রোমান দেবদেবীর মন্দির গড়ে ওঠেনি, সেখানকার নাগরিকদের ভেতরেও খ্রীষ্টধর্মই প্রচলিত হয়েছিল, গ্রীস-রোমের পৌত্তলিক ধর্মের কিছুমাত্র প্রভাব সেখানে ছিল না।

কনস্টান্টাইনের মৃত্যুর প্রায় ৫০ বছর পর ৩৯৫ খ্রীষ্টাব্দে রোম সাম্রাজ্য দুভাগে ভাগ হয়ে যায়। এই সাম্রাজ্যের ইউরোপীয় অংশে সম্রাট হন হনেরিয়াস আর প্রাচ্য অংশে আর্কেডিয়াস। পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী হল রোম (পরে র্যাভেনা), আর প্রাচ্য রোম সাম্রাজ্যের রাজধানী বাইজান্টিয়াম। ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে

বর্বরদের অভিযানের
রোমান সাম্রাজ্যের
বিভাজন ফলে পশ্চিমে রোমান
সাম্রাজ্যের পতন

ঘটলেও প্রাচ্যে রোমান সাম্রাজ্য টিকে থাকে এবং প্রাচ্য রোমান সম্রাটরা পশ্চিমের রোমান সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের কয়েকবার ব্যর্থ চেষ্টা করেন।

বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য স্বাধীন রোমান সাম্রাজ্যে পরিণত হবার প্রায় শতাধিক বছর পরে ৫১৮ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট এ্যানাস্টাসিয়াসের মৃত্যুর পর বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের সিংহাসন অধিকার করেন জাস্টিন নামে এক নিরক্ষর সৈনিক।

জাস্টিনিয়ানের
সিংহাসন লাভ তিনি জাতিতে রোমান হলেও বস্তুত অঞ্চলের
অধিবাসী ছিলেন। তিনি তাঁর ভাইপো
জাস্টিনিয়ানকে নিজের উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন এবং উগরুত



সম্রাট জাস্টিনিয়ান

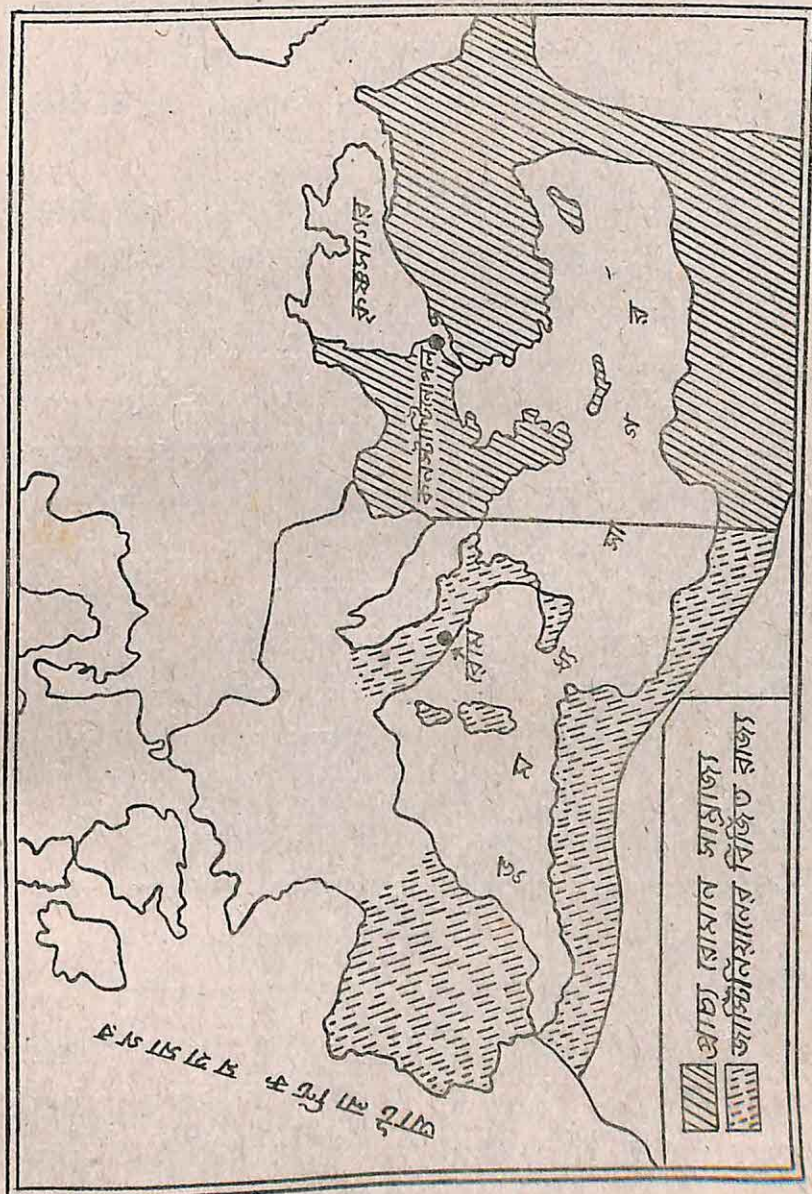
শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। সম্রাট জাস্টিনিয়নের রাজত্বকালেও তিনিই প্রকৃতপক্ষে রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। অবশেষে ৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে ৪৫ বছর বয়সে তিনি বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

সিংহাসন লাভ করবার পর জাস্টিনিয়ানকে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। সম্রাট হবার অল্পকাল পরেই পারস্যের সঙ্গে যুদ্ধ বাধে। এই যুদ্ধ চলতে থাকার সময়ে ৫৩২ খ্রীষ্টাব্দে কনস্টান্টিনোপলে এক প্রবল বিদ্রোহ দেখা দেয়। জাস্টিনিয়ানকে এই রাজ্য বিস্তার বিদ্রোহ দমনে খুব অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়।

এই বছরেই পারস্যের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি ঘটে। এরপর জাস্টিনিয়ান পশ্চিম ইউরোপে সামরিক অভিযান আরম্ভ করেন। পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর সেখানে জার্মান উপজাতিগুলো যেসব রাজ্য গড়ে তুলেছিল সেগুলো অধিকার করে রোমান সাম্রাজ্যের লুপ্ত গৌরব ফিরিয়ে আনা ছিল তাঁর সংকল্প। তাঁর সুযোগ্য সেনাপতি বেলিসারিয়াসের নেতৃত্বে এক সৈন্যদল প্রথম আফ্রিকায় রোমান সাম্রাজ্যের যে অঞ্চল ভ্যাণ্ডালদের অধিকৃত ছিল তা অধিকার করে ভূমধ্যসাগরে ভ্যাণ্ডালদের প্রাধান্য বিলুপ্ত করে। প্রায় বিশ বছর ধরে ক্রমাগত যুদ্ধ চালিয়ে জাস্টিনিয়ানের সেনাবাহিনী শেষ পর্যন্ত স্পেন, সিসিলি, কর্সিকা, সার্ডিনিয়া এবং ইতালী অধিকার করতে সক্ষম হয়। কিন্তু গল্দেশ এবং ব্রিটেন জয় করা আর জাস্টিনিয়ানের পক্ষে সম্ভব হয় নি, কারণ ৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ৮৩ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

এই রাজ্যবিস্তার বাইজান্টাইন সম্রাটদের পক্ষে খুব লাভজনক হয়নি, কারণ সম্রাট জাস্টিনিয়ানের মৃত্যুর অল্প পরেই লোম্বার্ড উপজাতি আবার ইতালী অধিকার করে। ভ্যাণ্ডালদের উত্তর আফ্রিকা থেকে তাড়িয়ে বাইজান্টাইন নৌবাহিনী ভূমধ্যসাগরে প্রাধান্য বিস্তার করায় ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসাবে এবং ইউরোপ ও এশিয়ার বাণিজ্যিক সম্পর্কের কেন্দ্র হিসাবে কনস্টান্টিনোপলের

এটির শ্রীবৃদ্ধি হয়েছিল বটে, কিন্তু দীর্ঘকাল পশ্চিম ইউরোপের যুদ্ধে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করার ফলে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের পূর্ব ও উত্তর



সীমান্তের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে হুণেরা একসময়

কনস্টান্টিনোপল আক্রমণ করে ও রাজধানীর পতনের সম্ভাবনা দেখা দেয়। স্লাভ উপজাতি আদ্রিয়ানোপল অধিকার করে, বিখ্যাত বাণিজ্যকেন্দ্র এ্যাঙ্কিয়োক শহর পারস্যের সেনাবাহিনীর হাতে লুণ্ঠিত হয়, বলকান অঞ্চল বর্বরদের ক্রমাগত অভিযানের ফলে বিধ্বস্ত হয়। তাই সম্রাট জাস্টিনিয়ানের মৃত্যুকালে তাঁর সাম্রাজ্য অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে।

সম্রাট জাস্টিনিয়ানের রাজ্যজয় নীতি শেষ পর্যন্ত বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের পক্ষে কল্যাণকর হয়নি সত্যি, কিন্তু বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগ হল জাস্টিনিয়ানের রাজত্বকাল। তাঁর মত কৃতী সম্রাট এই রাজ্যের সিংহাসনে আর কেউ বসে নি। স্বৈরাচারী বাইজান্টাইন শাসক হলেও তিনি রাজ্যের উন্নতির জন্য বিশেষ সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগ সচেষ্ট ছিলেন। ইউরোপে এমন শাসক সে যুগে আর জন্মান নি যিনি পাণ্ডিত্যে, শিল্প-সাহিত্য-ভাস্কর্যের পৃষ্ঠপোষকতায় এমন কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পেরেছেন। তাঁর উদ্যোগে ও পরামর্শে নির্মিত সেন্ট সোফিয়া গির্জা মধ্যযুগের এক আশ্চর্য শিল্পসৃষ্টি বলে আজও স্বীকৃত। তাঁর সময়েই দেয়ালের গায়ে রঙীন চিত্রকলা, কাঁচের ওপর রঙীন নকশা ও চিত্রকলার নূতন শিল্পরীতির সৃষ্টি হয়। এইসব শিল্প-কর্মের মধ্য দিয়ে বাইজান্টাইন সভ্যতা আজও মানুষের কাছে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে।

রোমান আইনকে সুশৃঙ্খলভাবে লিপিবদ্ধ করে সম্রাট জাস্টিনিয়ান ভাবীকালের সভ্যতাকে চিরস্থায়ী করে গিয়েছেন। তাঁর রচিত আইনের পুঁথিপত্রের সাহায্যেই পরবর্তিকালে ইউরোপে আইনের বিধি-বিধানের কাঠামো রচিত হয়। তিনি যে অসংখ্য আইনবিধি সংক্রান্ত পুস্তক রচনা করে রেখে গিয়েছেন তা মানব সভ্যতার এক অমূল্য সম্পদে পরিণত হয়েছে। তাঁর রচিত পুস্তক ‘কর্পাস জুরিস সিভিলিস’-এ (রাষ্ট্রীয় আইনবিধি) স্বৈরাচারী সম্রাটের চরম ক্ষমতার ক্ষেত্র বর্ণনা করা হয়েছে। গির্জার বিশেষ সন্যোগ-সুবিধা, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ভোগের

আইনবিদ
জাস্টিনিয়ান

অধিকার প্রভৃতি এই পুস্তকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। মধ্যযুগীয় ইউরোপের রাষ্ট্রকাঠামোর বিকাশে এবং নাগরিকদের আইনগত অধিকারের ধারণা সৃষ্টিতে জাস্টিনিয়ানের 'কর্পাস জুডিসিয়াস'-এর দান যে অসামান্য তাতে সন্দেহ নেই।

সপ্তম শতাব্দী থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের জীবনকালকে বাইজান্টাইন যুগ বলা হয়ে থাকে। এই কালেই বাইজান্টিয়াম পৃথিবীর সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মৌলিক অবদানের কৃতিত্ব প্রদর্শন করে। এর আগে পর্যন্ত বাইজান্টাইন যুগ বাইজান্টাইন সম্রাটেরা রোমান সভ্যতার রীতি-নীতি, রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা, ভাষাভঙ্গীর অনুকরণ করতো। শিল্প-ভাস্কর্যেও রোমান ঐতিহ্য অনুসরণের চেষ্টাই ছিল বাইজান্টাইন সভ্যতার প্রচলিত নিয়ম। কিন্তু বিশ্বয়ের বিষয় হল এই যে, সম্রাট এবং অভিজাতগোষ্ঠীর মানুষেরা ছাড়া বাইজান্টিয়ামের বাকী সমস্ত অধিবাসী ছিল গ্রীক, পারসিক এবং বিভিন্ন উপজাতি। হেরাক্লিয়াসের সময় থেকেই (৭ম শতাব্দী) সর্বপ্রথম গ্রীকভাষা বাইজান্টিয়ামের সরকারী ভাষা হিসাবে মর্যাদা লাভ করে এবং রাষ্ট্রীয় ও সমাজ জীবনের সকল ক্ষেত্রে গ্রীক-ভাষার বহুল প্রয়োগ শুরু হয়। ফলে বাইজান্টিয়ামের রোমান ঐতিহ্য দ্রুত লোপ পায়। তখন থেকেই বাইজান্টিয়ামের শিল্প-সংস্কৃতি, জ্ঞান-চর্চা ও শাসনব্যবস্থার ধারা গ্রীক ও প্রাচ্যরীতির সুন্দর সংমিশ্রণে এক নূতন সভ্যতার বিকাশ ঘটায়। এইজন্য এই যুগকে বাইজান্টাইন যুগ বলা হয়ে থাকে।

বাইজান্টিয়াম বা কনস্টান্টিনোপল এশিয়া ও ইউরোপের সন্ধিস্থলে অবস্থিত। তাই এই রাজ্য ব্যবসা-বাণিজ্যে খুব সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। ভূমধ্যসাগরের উপর বাইজান্টাইন নৌবহরের পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকায় প্রাচ্য দেশের দ্রব্যসামগ্রী ইউরোপে আর ইউরোপের দ্রব্য-ব্যবসা-বাণিজ্য সামগ্রী প্রাচ্য দেশে প্রেরণের সুযোগ পেয়েছিল ও শিল্প এখানকার ব্যবসায়ীরা। পারস্ত, সিরিয়া, মিশর, প্রভৃতি দেশ থেকে নানা মূল্যবান দ্রব্যাদি বাইজান্টিয়ামের বাজারে।

আসতো ইউরোপ জুড়ে বিক্রয়ের জন্য। মেসোপোটেমিয়ার মধ্য দিয়ে ভারত, চীন প্রভৃতি দেশের উন্নত মানের পণ্যসামগ্রী এখানকার বাজারে আসতো। এর ফলে ব্যবসায়ী শ্রেণীর প্রচুর আয় হত বলে এই রাজ্যের শিল্পোন্নতি ঘটে। কারুকার্য ও রং-করা ধাতু এবং কাঁচ-পাত্র নির্মাণে বাইজান্টিয়াম বিশেষ বিখ্যাত হয়ে ওঠে।

রোমের পতনের পর প্রাচীন গ্রীক দর্শন-বিজ্ঞান-সাহিত্য-শিল্পের অনুশীলন ইউরোপে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। জার্মান উপজাতি-

প্রাচীন সভ্যতা-
সংস্কৃতির রক্ষক

গুলো সভ্যতা-সংস্কৃতিতে পশ্চাৎপদ ছিল বলে তাদের

শাসনে গ্রীক-রোমান জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য

অবহেলিত হয়। এগুলো খ্রীষ্টান ধর্মীয় ভাব-ভাবনার

বিরোধী বলে ক্যাথলিক যাজক সম্প্রদায় মনে করতে। বাইজান্টিয়ামে

গ্রীক ভাষা রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভের ফলে গ্রীস দেশে এবং

মিশরের অন্তর্গত আলেকজান্দ্রিয়া শহরের বিখ্যাত গ্রন্থাগারে এইসব

প্রাচীন শাস্ত্রচর্চা উৎসাহিত হয়। জার্মান শাসনাধীন ইউরোপ থেকে

রোমান পণ্ডিতেরা বাইজান্টিয়ামে চলে আসেন। গ্রীক সংস্কৃতির

প্রভাবে বাইজান্টিয়ামের গির্জা ও যাজক সম্প্রদায় প্রাচীন সংস্কৃতির

অনুরাগী হয়ে ওঠে। মিশর, এশিয়া মাইনর, সিরিয়া, পারস্য মুসলমান

শাসনাধীন হলে দর্শন, গণিত, বিজ্ঞানের পণ্ডিতেরা বাইজান্টাইন

সাম্রাজ্যে, বিশেষ করে কনস্টান্টিনোপলে আশ্রয় নিলে তাঁদের জ্ঞান-

বিজ্ঞানচর্চা অব্যাহত রাখেন। ফলে প্রাচীন গ্রীক-রোমান সাংস্কৃতিক

ঐতিহ্য ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায়। পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাই-

জান্টাইন সাম্রাজ্যের পতন ঘটলে এইসব পণ্ডিতেরা ইউরোপে পালিয়ে

আসেন। তখনই ইউরোপ এই প্রাচীন সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হয়,

আর তাতেই ইউরোপে শুরু হয় নবজাগৃতির যুগ।

অনুশীলনী

১। বাইজান্টাইন সভ্যতার প্রথম প্রতিষ্ঠাতা কে? মধ্যযুগের ইউরোপে তিনি কেন বিখ্যাত হয়ে আছেন?

২। কনস্ট্যানটাইন কে ছিলেন? কিভাবে তিনি সমগ্র রোম সাম্রাজ্যের সম্রাট হন?

৩। ইউরোপে খ্রীষ্টধর্মের প্রসারে রোমান সম্রাট কনস্ট্যানটাইনের অবদান সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৪। জাস্টিনিয়ান কে? কখন এবং কিভাবে তিনি বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের সিংহাসন লাভ করেন? রোমান সাম্রাজ্যকে এক্যবদ্ধ করার জন্য তাঁর প্রচেষ্টা সংক্ষেপে বর্ণনা কর। এর ফল কি হয়েছিল?

৫। সম্রাট জাস্টিনিয়ানের বিজয় অভিযানের বিবরণ ও কলাকল লিখ। ইউরোপের ইতিহাসে তিনি কেন বিখ্যাত হয়ে আছেন?

৬। 'বাইজান্টাইন যুগ' কাকে বলে? কিজন্য এই যুগকে 'বাইজান্টাইন যুগ' বলা হয়? পৃথিবীর ইতিহাসে বাইজান্টাইন সভ্যতার অবদান আলোচনা কর।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

ক। শূন্যস্থান পূরণ কর :—

(১) — খ্রীষ্টকে সম্রাট—কনস্টান্টিনোপলের প্রতিষ্ঠা করেন।

(২) — নগরীকে 'নতুন রোম' বলা হয়।

(৩) কনস্টান্টিনোপলের আর এক নাম—।

(৪) — সম্রাট জাস্টিনিয়ানের প্রধান সেনাপতি ছিলেন।

(৫) — 'এর শাসনকাল হইতে 'বাইজান্টাইন যুগ' আরম্ভ হয়।

(৬) সেন্ট দোফিয়া গির্জা নির্মাণ করান—।

(৭) — খ্রীষ্টকে কনস্ট্যান্টাইন সমগ্র রোমান সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হন।

(৮) বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যে খ্রীষ্টধর্মকে রাজকীয় ধর্মের মর্যাদা প্রদান করেন—।

(৯) — বৎসর বয়সে জাস্টিনিয়ান বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের সিংহাসনে উপবেশন করেন।

খ। টীকা লিখ :—

(১) মিলান বিধি, (২) বেলিসারিয়াস, (৩) 'কর্পাস জুরিস্ সিভিলিস'।

পঞ্চম অধ্যায় ইসলামের অভ্যুদয়

[বিষয়বস্তু সংক্ষেপ : এশিয়া ও আফ্রিকার মধ্যবর্তী অঞ্চল আরবদেশ । আফ্রিকার উত্তর-পূর্বে মিশর আর আর পূর্বের দেশ আরবের মাঝখানে লোহিত সাগর । এই অঞ্চলের বেশির ভাগ অংশ মরুভূমি, কেবল সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চল আর মরুভূমির মাঝে মাঝে কিছু কিছু মৃদুদ্যানে জনবসতি । অধিবাসীদের এক বড় অংশ যাযাবর বেহুইন । সপ্তম শতাব্দীতে এই দেশেই ইসলাম ধর্মের অভ্যুদয় হয় । মহম্মদ এই ধর্মের প্রবর্তক । নানা উপজাতিতে বিভক্ত এই দেশের মানুষকে ইসলাম ধর্ম এক্যবদ্ধ করে তুলেছিল । কলে আরবরা এক নতুন উন্মাদনায় অধীর হয়ে ছুনিয়া জয়ের অভিযানে নেমেছিল । সপ্তম শতাব্দী থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যে আরবদের বিজয় অভিযান এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকার এক বিরাট অঞ্চলে বিশাল রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে এবং সারা পৃথিবীতে ইসলাম ধর্মের বাণী ছড়িয়ে দেয় । পৃথিবী; নানা দেশের জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প সংস্কৃতিকে সংগ্রহ ও অনুশীলন করে ইসলামী সভ্যতা বিশ্বের সংস্কৃতি-সভ্যতার ক্ষেত্রে মূল্যবান অবদান রেখে গিয়েছে ।]

আরব উপদ্বীপ এক বিরল বসতির দেশ । লোহিত সাগর, ভারত মহাসাগর আর পারস্য উপসাগরের লোনা জল এর তিন দিক ঘিরে আছে । ধু ধু মরুভূমির দেশ এই আরবভূমির মানুষেরা সেমিটিক জাতির অন্তর্গত । এরা ছিল নানা উপজাতিতে বিভক্ত এবং এদের অধিকাংশই ছিল যাযাবর মরুবাসী । আরবী ভাষায় এদের বেহুইন বলা হয় । আরবের একপাশে ছিল রোমান সাম্রাজ্যের অংশ মিশর, জেরুজালেম ও সিরিয়া, আর অন্য পাশে ছিল পারস্য সাম্রাজ্য । মাত্র এক শতাব্দীর ভেতরে এই মানুষেরা তাদের ভেদাভেদ হানাহানি তুলে এমন এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল যার একপ্রান্ত পশ্চিম ইউরোপের পিরিনিজ পর্বতমালা আর এক প্রান্ত ভারতবর্ষ পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয় । রোমান সাম্রাজ্য চরম উন্নতির

দিনে আয়তনে যতবড় ছিল, আরবদের এই সাম্রাজ্য তা থেকে অনেক বেশি বড় হয়েছিল।

আরবজাতির এই প্রবল প্রকাশের পেছনে যে শক্তি কাজ করেছিল তা হল এক নূতন ধর্ম ইসলাম-এর অভ্যুদয়। ইসলাম একটি আরবী ভাষার শব্দ। এর অর্থ হল 'ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে

আত্মসমর্পণ।' এই ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা হজরত (পবিত্র)

হজরত মহম্মদ

মহম্মদ। আনুমানিক ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ মকায়

জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা আবদুল্লা কোরেশ উপজাতির লোক

ছিলেন। মকায় আরবদের যে ধর্ম মন্দির ছিল, কোরেশরা ছিল

সেই মন্দিরের রক্ষক ও পরিচালক। মহম্মদ ধনী পরিবারের সন্তান

ছিলেন না, তাই যৌবনেই তাঁকে এক ব্যবসায়ে চাকরি করতে যেতে

হয়। এই ব্যবসায়ের মালিক ছিলেন খাদিজা নামে এক ধনী মহিলা।

পরবর্তিকালে মহম্মদ এই মহিলাকে বিয়ে করেন। ক্রমে তাঁর মনে

এক নূতন ধর্মভাবের উদয় হতে থাকে, তিনি এক এবং অদ্বিতীয়

ঈশ্বরের ধারণায় মত্ত হয়ে ওঠেন। তিনি প্রথম তাঁর এই উপলব্ধির

কথা বন্ধুমহলে ব্যক্ত করতে বা আবৃত্তি করতে (কোরান) আরম্ভ

করেন। পরে তিনি প্রকাশ্যভাবে মকায় আরব অধিবাসীদেরও এই

বাণী শোনাতে থাকেন। মক্কার সমাজপতিরা এতে রেগে গিয়ে

তাঁকে হত্যা করবার চেষ্টা করলে তিনি তাঁর জন্মভূমি ত্যাগ করে

৬২২ খ্রীষ্টাব্দে মক্কা থেকে ৩০০ মাইল দূরবর্তী 'ইয়াথিব' নামে এক

শহরে পালিয়ে যান। এই পলায়নকেই আরবী ভাষায় 'হিজরা' বলা

হয়। এই সময় থেকেই ইসলাম ধর্মের আবির্ভাব হল বলে মনে করা

হয় এবং সমস্ত ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা এই তারিখ থেকে নূতন এক

বৎসর গণনা করে থাকেন, তাকে হিজরী সংবৎ বলা হয়।

ইয়াথিব-এর অধিবাসীরা তাঁর নূতন ধর্মমতে বিশ্বাসী হয় এবং

এখানেই সর্বপ্রথম ইসলাম ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায় গড়ে ওঠে। এরপর

থেকে এই শহরের নামকরণ করা হয় 'মদিনাৎ এল নবী' অর্থাৎ

ঈশ্বর প্রেরিত মহাপুরুষের নগর। সংক্ষেপে একে মদিনা বলা হয়ে

থাকে। মহম্মদ প্রবর্তিত এই নূতন ধর্মের মূলকথা হল ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়। তিনি সকল মানুষের স্রষ্টা, তাই মানুষে মানুষে কোন ভেদ নেই। সব মানুষই 'আল্লাহ' অর্থাৎ ইসলামের শিক্ষা

ঈশ্বরের সন্তান। বহু দেবদেবীর পূজা ত্যাগ করে সমস্ত মানুষকে এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বরের নিকট আত্মসমর্পণ করতে হবে, প্রতিদিন পাঁচবার করে তাঁর উপাসনা করতে হবে এবং সব মানুষকে ভেদাভেদ ভুলে এক্যবদ্ধ হতে হবে।

ক্রমে আরবের অধিবাসীরা দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে আরম্ভ করে এবং আরব দেশের যে উপজাতিগুলো এতদিন নিজেদের মধ্যে হানাহানি করে আসছিল, ইসলাম ধর্ম তাদের মধ্যে এক্য ও ভ্রাতৃত্বের এক সুদৃঢ় বন্ধন গড়ে তোলে। হজরত মহম্মদের নেতৃত্বে এক নূতন, এক্যবদ্ধ আরব রাষ্ট্র গড়ে ওঠে। মক্কা নগরী হয়ে ওঠে এই রাষ্ট্রের কেন্দ্র, আর এতদিন ধরে আরবরা যে কাবা মন্দির ইহুদীদের গোষ্ঠীপিতা আব্রাহামের প্রতিষ্ঠিত পবিত্র স্থান মনে করে পূজা করতো সেই কাবা মন্দির (মসজিদ)-কেই হজরত মহম্মদ ইসলামের পবিত্র তীর্থ বলে ঘোষণা করেন। এইভাবেই ইসলাম ধর্ম আরবদেশে ধর্ম ও রাষ্ট্রের মিলন ঘটায়। ধর্মনেতা বা ঈশ্বরের প্রতিনিধি আর রাষ্ট্রের প্রধান হয়ে ওঠেন একই ব্যক্তি। আরবী ভাষায় তাঁকে বলা হয় খলিফা।

৬৩০ খ্রীষ্টাব্দে মক্কা অধিকার করে মহম্মদ আরব দেশে ইসলাম ধর্মকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করার দুই বৎসর পর (৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে) তাঁর মৃত্যু হয়। মহম্মদের মৃত্যুর পর আরব জাতি ওমর, ওসমান এবং মাবিয়া এই তিন খলিফার নেতৃত্বে এশিয়া এবং ইউরোপের বহু অঞ্চল জয় করে এক বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। ৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দে মসোপটেমিয়া (ইরাক), ৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে সিরিয়া, ৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে মিশর এবং ৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে পারস্য ইসলামের পবিত্র বাহিনীর পদানত হয় এবং ৬৬১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ইসলামী সাম্রাজ্য তিউনিশিয়া থেকে তুর্কীস্থানের বন্দু নদ এবং ভারত সীমান্ত

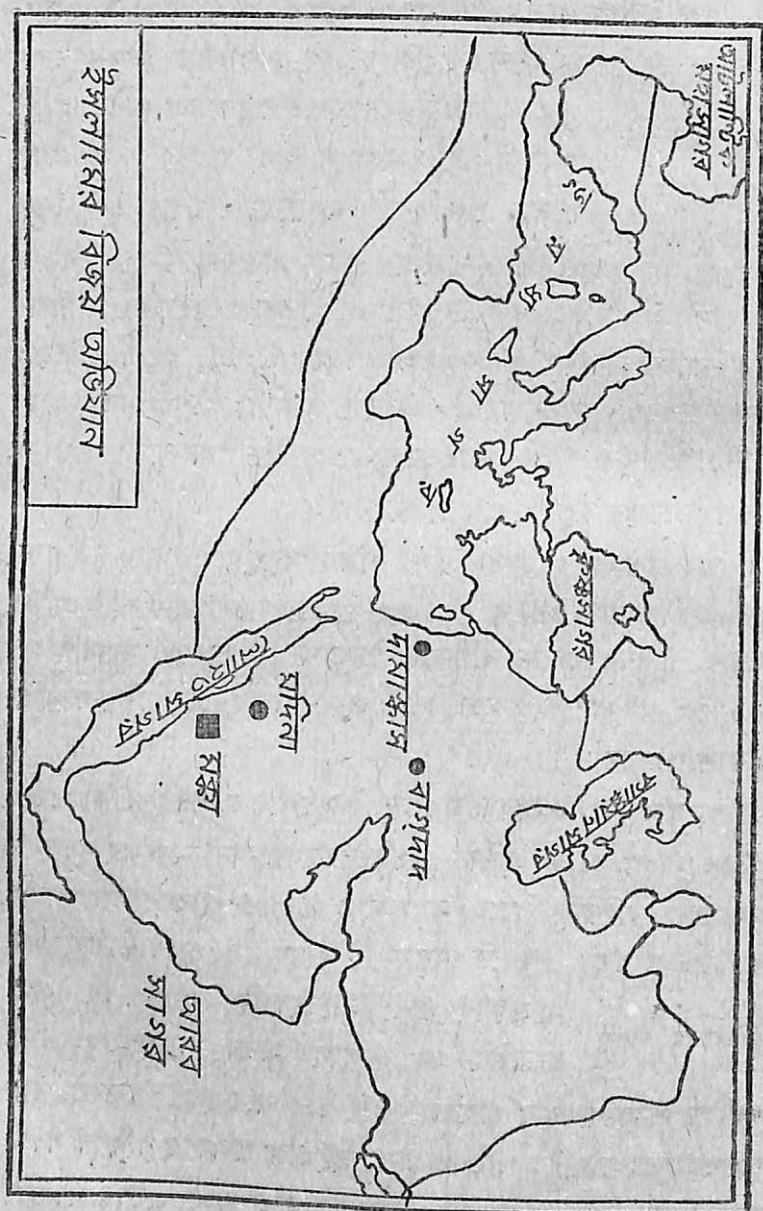
পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়। মাবিয়া মক্কা থেকে দামাস্কাসে (সিরিয়া) রাজধানী স্থানান্তরিত করেন।

কিন্তু ইসলাম ধর্মের পতাকাতে হজরত মহম্মদ আরব উপজাতি-গুলোকে যে একেবারে বন্ধনে বেঁধেছিলেন এই সময় তাতে ভাঙন দেখা দেয়। মাবিয়ার নেতৃত্বে উম্মাইদ বংশ আরব রাষ্ট্রের উপজাতি বিরোধ ক্ষমতায় আসীন হলে আব্বাসী বংশের সঙ্গে প্রবল উম্মাইদ বনাম আব্বাসী বংশ সংঘাত শুরু হয়। মহম্মদের দৌহিত্র এবং চতুর্থ খলিফা আলীর পুত্র হাসান-হুসেনের নেতৃত্বে আব্বাসী বংশ মদিনায় পাল্টা খিলাফে প্রতিষ্ঠা করেন কিন্তু মাবিয়ার পুত্র ইয়াজিদ হাসান-হুসেনকে হত্যা করে আব্বাসী বংশের বিজ্রোহ দমন করেন। অবশেষে, ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে আব্বাসী বংশের নেতা মহম্মদ হানিফা উম্মাইদ খলিফা মারওয়ানকে হারিয়ে আব্বাসী বংশকে ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তৃত্বে প্রতিষ্ঠা করেন।

৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে আব্বাসী বংশের খলিফা মনসুর বাগদাদে (ইরাক) রাজধানী স্থানান্তরিত করেন এবং গোলাকার বাগদাদ শহর প্রতিষ্ঠা করেন। তখন থেকে বাগদাদ ইসলামী সাম্রাজ্যের মধ্যমণি হয়ে ওঠে এবং বাগদাদকে কেন্দ্র করে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা, শিল্প-সংস্কৃতির বিকাশ শুরু হয়।

আব্বাসী খলিফাদের রাজত্বকালেই মুসলিম জগতের এক্য ভেঙে পড়তে আরম্ভ করে। এশিয়া এবং ইউরোপের নানা অঞ্চলের মুসলমান রাজ্যগুলি খলিফার কাছে নামে মাত্র আনুগত্য স্বীকার করে কার্যতঃ স্বাধীনভাবে রাজ্য চালাতে থাকে। কারণ সে সময় এশিয়া এবং আফ্রিকার নানা জাতিগোষ্ঠী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল এবং বিশাল আরব সাম্রাজ্যের নানা অঞ্চলের শাসনব্যবস্থায় প্রাধান্য বিস্তার করে বসেছিল। কেবল মাত্র আরবজাতির সামরিক শক্তিতে এসব জাতিকে খলিফার পরিপূর্ণ অধীন করে রাখা সম্ভব ছিল না। তাই আরব খলিফারা এইসব অঞ্চলের নামে মাত্র আনুগত্যের স্বীকৃতিতেই সন্তুষ্ট থাকতেন এবং এক বার্ষিক

রাজস্বের বিনিময়ে এসব অঞ্চলের শাসকদের স্বাধীনভাবে রাজত্ব করবার অধিকার স্বীকার করে নিতেন। ফলে উম্মাইদ খলিফাদের



তুলনায় আব্বাসী খলিফাদের শক্তি হ্রাস পায় বটে কিন্তু আব্বাসী

বংশের রাজত্বকালেই আরবজাতির ইসলামী রাষ্ট্র জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-সংস্কৃতিতে সে যুগের অত্যন্ত রাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয় হয়ে ওঠে।

নবম শতাব্দীতে খলিফা হারুন-অল-রসিদ একজন তুর্কীকে প্রধান সেনাপতি পদে নিয়োগ করেন। তাঁর আরব খলিফাদের পুত্র মাহমুন খলিফা হবার পর তুর্কী সৈন্যের পতন সাহায্যে তাঁর দেহরক্ষী বাহিনী গঠন করেন।

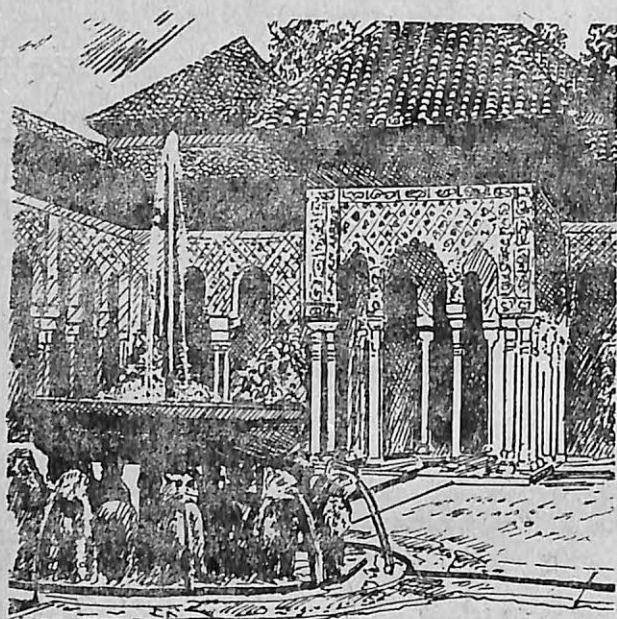
৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে বাগদাদের আরব নাগরিকেরা তুর্কী সৈন্যবাহিনীর ওপর বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলে রাজধানী ৬০ মাইল দূরবর্তী সামারায় স্থানান্তরিত হয়। ক্রমে খলিফারা তুর্কী সেনাপতিদের হাতের পুতুল হয়ে ওঠেন এবং অবশেষে, ১০৫৫ খ্রীষ্টাব্দে এশিয়ার অধিকাংশ এলাকাতেই তুর্কী রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সেনজুক তুর্কীরা বাগদাদ দখল করে নেয়। ফলে মুসলমান জগতের ধর্মনেতার আসন আরবদের অধিকার থেকে বিচ্যুত হয়ে সেনজুক তুর্কীদের হাতে চলে যায়।

১১১ খ্রীষ্টাব্দে উস্মাইদ বংশীয় সেনাপতি তারিক ইবানু জিয়াদ সাত হাজার বারবারি ও মুর সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে স্পেন আক্রমণ করেন এবং সেখানকার শেষ ভিসিগথ রাজাকে স্পেনে মুসলিম পরাজিত করে সেখানে এক মুসলিম রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। আরবী ভাষায় এই নূতন রাজ্যের নামকরণ করা হয় আন্দালুশিয়া।

খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে আন্দালুশিয়ার দুই প্রধান শহর কর্ডোভা আর তলেদো সভ্যতা-সংস্কৃতির উৎকর্ষে পশ্চিম ইউরোপে শীর্ষস্থানীয় হয়ে ওঠে। কর্ডোভার রাজপথ আলোকসজ্জিত এবং পাথর দিয়ে বাঁধানো ছিল, বাড়ীগুলোর দোতলার বারান্দা ছিল স্বেত-পাথর দিয়ে তৈরি, শীতকালে মোজেক-করা মেঝের তলা দিয়ে

কর্ডোভা গরম বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা ছিল। ৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত কর্ডোভার মসজিদ, গ্র্যানাডার আলহামরা প্রাসাদ এখনও স্পেনে মুসলিম সংস্কৃতির গৌরবের পরিচয় বহন করছে।

অষ্টম-নবম শতাব্দীতে ইউরোপীয় চারণ কবিরা কর্ডোভায় সংগীত শিক্ষা করতে যেতেন, পশ্চিম ইউরোপের অভিজাত পরিবারের মহিলারা কর্ডোভায় তৈরি রুচিসম্মত পোশাক পরে গর্ব অনুভব করতেন। ফ্রান্স, ইংলণ্ড থেকে শিক্ষার্থীরা কর্ডোভায় আসতো বিজ্ঞান, দর্শন আর



আলগাম্বরা প্রাসাদ

চিকিৎসাবিজ্ঞা শিখতে। কর্ডোভার ইহুদী ধর্মযাজক রাব্বি-বেন-এজরার কাছ থেকেই পশ্চিম ইউরোপের মানুষ ভারতীয় সংখ্যালিখন পদ্ধতির জ্ঞান অর্জন করেছিল। আন্দালুশিয়ার আরব, ইহুদী আর খ্রীষ্টান পণ্ডিতদের উদ্যোগেই এরিস্টটলের দর্শন-বিজ্ঞান গ্রন্থ, টলেমির জ্যোতির্বিজ্ঞান ও গণিত গ্রন্থাদি গ্রীক ভাষা থেকে আরবী ভাষায় এবং আরবী থেকে লাতিন ভাষায় অনূদিত হয়ে ইউরোপের খ্রীষ্টান সমাজে প্রচারিত ও প্রচলিত হয়।

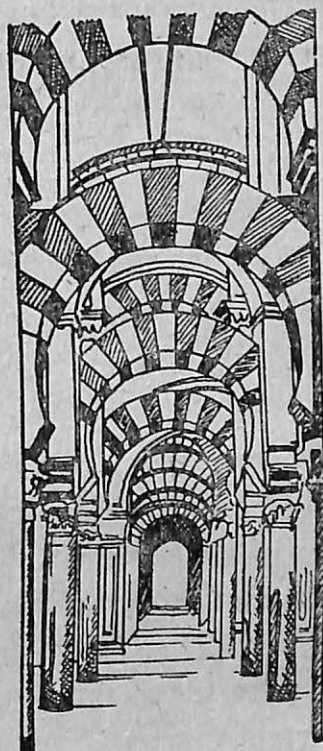
ইসলামের অভ্যুদয়, বিশাল মুসলিম সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা এবং আরব বাহিনীর বিজয় অভিযান বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য এবং পশ্চিম ইউরোপকে শঙ্কিত এবং সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল। আক্রমণকারী

মুসলমানরা বিজিত দেশের খ্রীষ্টান বা ইহুদীদের ধর্মাস্তরিত করবার জন্য
 ইসলামের সাফল্যে অত্যাচার বা জোর-জুলুম করতো না, সৈন্যবাহিনী
 ইউরোপের যথেষ্ট লুণ্ঠন বা অত্যাচার সাধারণতঃ করতো না।
 প্রতিক্রিয়া তবু ইউরোপের ও বাইজান্টিয়ামের খ্রীষ্টান জগৎ
 মুসলমানদের সম্পর্কে খুব হীন ধারণা পোষণ
 করতো। খ্রীষ্টধর্মের প্রভাব নষ্ট হয়ে যাবার আশঙ্কায় রোম এবং

কনস্টান্টিনোপলের যাজক সম্প্র-
 দায় ইসলাম ধর্ম ও তার অনু-
 গামীদের বিরুদ্ধে ইউরোপ
 আর বাইজান্টিয়ামের মানুষদের
 উত্তেজিত করে তুলেছিল। প্রথম
 দিকে আরব বাহিনী এশিয়া,
 আফ্রিকা ও স্পেনে সাফল্যলাভ
 করলেও বাইজান্টাইন সম্রাটরা
 এশিয়া মাইনর ও কনস্টান্টি-
 নোপল মুসলিম বাহিনীর হাত
 থেকে দীর্ঘকাল রক্ষা করেন।
 অন্ত্যদিকে ফ্রাঙ্ক উপজাতির রাজা
 চার্লস মার্টেল ৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে
 স্পেনের আরব বাহিনীকে
 পোয়াত্তেরায় যুদ্ধে পরাজিত করে
 ইউরোপে মুসলিম বাহিনীর অগ্র-
 গতি রোধ করেন। তারপর

দীর্ঘকাল ধরে ফ্রাঙ্ক বাহিনী মুসলিম বাহিনীকে স্পেনের সীমানা
 ছেড়ে আর এগুতে দেয়নি। অবশেষে, ১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দে স্পেন
 পুরোপুরি মুসলিম আধিপত্য থেকে মুক্ত হয়।

কিন্তু মধ্যযুগীয় ইউরোপে যে সব মানুষ জ্ঞানপিপাসায় অধীর
 হয়ে উঠেছিলেন সেই 'অন্ধকার যুগে', তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ



কর্ডোভার মসজিদ

জীবন বিপন্ন হতে পারে জেনেও স্পেনের কর্ডোভা, তলেডো প্রভৃতি জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রগুলিতে যাতায়াত করতে আরম্ভ করেন। তাঁদের মারফতই ইউরোপ ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতির পরিচয় প্রথম লাভ করে। মধ্যযুগীয় ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার বিকাশে ইসলামের অভ্যুদয় মূল্যবান সহযোগিতা প্রদান করেছিল।

মধ্যযুগে এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ জুড়ে ইসলামের এই ব্যাপক প্রসারের কারণ খুঁজতে গেলে দেখা যায় যে, ইসলাম ধর্মে যে সহজ, সরল সাম্যভাব ও ভ্রাতৃত্ববোধের আবেদন আছে, তাই যাযাবর আরব ইসলাম ধর্মের উপজাতিগুলোকে আকৃষ্ট করেছিল। পরবর্তিকালে বিস্তৃতির কারণ ধর্মের আদর্শ ও উন্মাদনায় এবং উপযুক্ত জীবিকার্জনের তাগিদে এক্যবদ্ধ আরবজাতি যে বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল তার প্রভাবেও এশিয়া-আফ্রিকার যাযাবর বা অর্ধ-যাযাবর যুদ্ধপ্রিয় উপজাতিগুলো ইসলাম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়। কিন্তু প্রধানতঃ এই ধর্মের জীবনমুখী ও সাম্যবোধের আবেদনই পৃথিবীর নানা দেশের মানুষকে এই ধর্মের আশ্রয় গ্রহণে ইচ্ছুক করে তোলে। ভারতে মুসলিম প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার বহু আগে থেকেই ভারতের মানুষ ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নিতে আরম্ভ করে। চীন, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে আরবের বিজয় অভিযান পরিচালিত হয় নি, তবু আরব বণিক, জলদস্যু ও প্রচারকদের প্রভাবে এসব অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল।

বিশ্বের সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আরবদের অবদান অতুলনীয়। ইসলামের অভ্যুদয়ের আগে যে মানবগোষ্ঠী জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প ও সংস্কৃতি ছিল নিতান্ত পশ্চাৎপদ, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার চিহ্নমাত্র যে সমাজে ছিল না, যারা বাড়ীঘর বানাতে পর্যন্ত জানতো না, সামান্য কয়েকশো বছরের ভেতর তারা জ্ঞান-বিজ্ঞান-সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে এতদূর অগ্রগী হয় যে, ইউরোপের জাতিগুলো তাদের সমকক্ষ হয়ে ওঠবার কথা চিন্তাও করতে পারতো না। ইসলামের

পবিত্র বাণী কোরানের নির্দেশ অনুযায়ী আরবরা রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দেশ-দেশান্তর থেকে দর্শন-বিজ্ঞান-সাহিত্যের অমূল্য অবদান সংগ্রহ করে আরবী ভাষায় অনুবাদ করে বিদ্যাচর্চায় মেতে উঠলো। গ্রীক ও ভারতীয় গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র প্রভৃতির পুঁথি আরবী ভাষায় অনুবাদের কাজ শুরু হল, দেশ-বিদেশের শিল্পকলা ও স্থাপত্যের জ্ঞান অর্জন করে তাকে আরও বিকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হল, ভারত ও গ্রীসের সাহিত্য অনুশীলনের মধ্য দিয়ে আরবী সাহিত্যের সৃষ্টি হল। খলিফাদের উৎসাহ-অনুকূল্যে, আরব অভিজাত সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় খুব অল্প কালের মধ্যেই আরব জাতি জ্ঞান-বিজ্ঞান-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে নূতন নূতন অবদান সৃষ্টি করতে লাগলো। গ্রীক গণিত ও দর্শনশাস্ত্রের অনুবাদে বিখ্যাত ছিলেন হুনায়েন ইবন ইশাক। বিখ্যাত আরব দার্শনিক কিন্ডি সংগীত, চক্ষুচিকিৎসা, রসায়ন, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও দর্শন সম্পর্কে আড়াই শতাব্দিক পুস্তক রচনা করেন। রাজেস নামে এক পণ্ডিত চিকিৎসাশাস্ত্র সম্পর্কে প্রায় দেড়শত পুস্তক রচনা করেন। হাম ও গুটিবসন্তের প্রকৃতি সম্পর্কেও তিনি নানা তথ্য আবিষ্কার করেন। গ্রীক, আরব, পারসীক ও ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের নানা মূল্যবান তথ্যের তিনি এক সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করেন। আরব পণ্ডিত আনবেরুণী সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্র অনুবাদ করেন। আরবরা ভারতীয় সংখ্যালিখন পদ্ধতি অনুসরণ করে পাটীগণিত রচনা করেন এবং তাঁদের কাছ থেকেই ইউরোপ এই জ্ঞান লাভ করে। দার্শনিক ইবনুরুক্শত, ইবন বতুতা মধ্যযুগের আরব মনীষীদের অগ্রতম ছিলেন। বাগদাদের বিখ্যাত গায়ক জিরিয়ান স্পেনে সঙ্গীত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ছিলেন নির্মাণ-শিল্পে বিখ্যাত আদি-অল্-মালিক। আরব চিত্রকলা এবং ভাস্কর্য পারসীক ও গ্রীক রীতির মিশ্রণে এক নূতন শিল্পসৃষ্টির পরিচয় দিয়ে বিশ্বের দরবারে স্থায়ী আসন লাভ করে।

সুতরাং একথা অনায়াসে বলা যায় যে, আরবজাতি মধ্যযুগের ইতিহাসে নূতন সভ্যতা-সংস্কৃতির উন্মেষ ঘটিয়েছিল।

অনুশীলনী

১। ইসলাম শব্দের অর্থ কি? কে, কখন ইসলাম ধর্মের প্রবর্তন করেন?
তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

২। ইসলাম ধর্মের অভ্যুদয়ের আগে আরবদেশের জীবনযাত্রার প্রকৃতি
সংক্ষেপে লিখ।

৩। খলিফা শব্দের অর্থ কি? কয়েকজন আঃব খলিফার নাম লিখ এবং
তাদের কীর্তিকলাপের পরিচয় দাও। আরবদের অধিকার থেকে খিলাফত কিভাবে
হস্তচ্যুত হয় বর্ণনা কর।

৪। উম্মাইদ ও আব্বাসী বংশের বিরোধের বিবরণ ও ফলাফল বর্ণনা কর।

৫। ইসলামের বিজয় অভিযানের বিবরণ লিখ।

৬। আন্দালুসিয়া কোন্ দেশের নাম? এটা কোন্ ভাষার শব্দ? কারা
এই নামকরণ করেছিল? আন্দালুসিয়ার একটি শহরের পরিচয় লিখ।
ইউরোপে এই শহরটির খ্যাতির কারণ কি?

৭। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক কে? পৃথিবীতে ইসলাম ধর্মের ব্যাপক
প্রসারের কারণ কি?

৮। পৃথিবীর সভ্যতা-সংস্কৃতিতে আরবজাতির অবদানের পরিচয় লিখ।

৯। টকা লিখ:—(ক) কর্ডোভা; (খ) হুমায়দ ইব্ন ইশাক; (গ)
মদিনা; (ঘ) কাবা মসজিদ; (ঙ) হিজরী সংবৎ।

১০। শূন্যস্থান পূরণ কর:—

(ক) — শতাব্দীতে আরবদেশে ইসলাম ধর্মের অভ্যুদয় হয়।

(খ) — খ্রীষ্টাব্দে হজরত মহম্মদ মক্কা ত্যাগ করেন।

(গ) 'কোরান' শব্দের অর্থ — করা।

(ঘ) মহম্মদের মক্কা পরিত্যাগের ঘটনাকে আরবী ভাষায় — বলা হয়।

(ঙ) বর্তমান মদিনা শহরের পুরাতন নাম —।

(চ) — খ্রীষ্টাব্দে হজরত মহম্মদের মৃত্যু হয়।

(ছ) আরবী ভাষায় স্পেনের নাম —।

(জ) — খ্রীষ্টাব্দে আলহামরা প্রাসাদ তৈরি হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মধ্যযুগের ইউরোপ

[**সংক্ষিপ্ত নার :** নবম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীকে পশ্চিম ইউরোপের 'ক্যারোলিনিয়ান যুগ' বা 'ক্যারোলিনীয় নবজাগৃতির যুগ' বলা হয়ে থাকে। এই চার শতাব্দীর ভেতর একদিকে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রসার ও অগ্রগতি হটতে থাকে, আর অন্যদিকে সারা ইউরোপ জুড়ে রোমান রাষ্ট্রচিন্তার ভিত্তিতে একচ্ছত্র সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা প্রবল হয়ে ওঠে। ফ্রাঙ্ক-সম্রাট শার্লমেনকে কেন্দ্র করে সংহতি ও সমন্বয়চেষ্টা রোমান গির্জা ও ক্যাথলিক যাজক সম্প্রদায়ের শক্তিবৃদ্ধিতে সহায়ক হয়। গির্জা ও মঠগুলি ক্রমে সামন্তশক্তিতে পরিণত হয়ে রাজশক্তি ও ধর্মশক্তির প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিবেশ সৃষ্টি করে। শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং শিল্প-সংস্কৃতি চর্চার উন্নতি-বিকাশে সম্রাট শার্লমেনের উদ্যোগ-উৎসাহ, গির্জা ও মঠের ঐকান্তিক প্রয়াস, ইউরোপে বর্ষের অভিযানের ফলে গড়ে ওঠা 'অন্ধকার যুগের' অবসান ঘটায়। প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-সংস্কৃতির অবদানকে আংশিক ভিত্তি করে ইউরোপের সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা চলতে থাকে। ক্যারোলিনীয় বংশের সম্রাট শার্লমেনের উদ্যোগ-উৎসাহ এই সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনের সূত্রপাত করে বলে একে 'ক্যারোলিনীয় নবজাগৃতির যুগ' বলা হয়ে থাকে। এই যুগের আর এক বৈশিষ্ট্য রোমান যুগের ভাব-ভাবনার, রোমান প্রাধান্যের প্রতি নির্ভরতার পরিবেশের অবসান।]

বর্ষের জার্মান উপজাতিদের আক্রমণের ফলে পাশ্চাত্য রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে গিয়ে যে সব জার্মান রাজ্য গড়ে ওঠে, গল্দেশের ভূমিকা : মেরো- ফ্রাঙ্ক রাজ্য তাদের অগ্রতম। ইতালীর উত্তরে বর্তমান ফ্রান্স, জার্মানী, অস্ট্রিয়া ও সুইজারল্যান্ডের ভিউ বংশ রাষ্ট্রসীমা জুড়ে ছিল গলরাজ্য। ফ্রাঙ্ক উপজাতি এই অঞ্চলের পশ্চিম অংশে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে এবং মেরোভিউ বংশের প্রধান ক্লভিস রোমের পতনের পর (৪৮১ খ্রীঃ) এই অঞ্চলে এক স্থায়ী রাজ্য গড়ে তোলেন।

৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে ক্যারোলিং বংশের এক সামন্ত-প্রধান পিঙ্গিন রোমের পোপ (ক্যাথলিক খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের যাজক-প্রধান) জাখারির সমর্থনপুষ্ট হয়ে মেরোভিউ বংশের শেষ রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করে ক্যারোলিং বংশের ফ্রাঙ্ক রাজ্যের রাজা হন। তাঁর বাবা চার্লস সিংহাসন অধিকার মার্টেল ছিলেন সমস্ত ফ্রাঙ্ক রাজ্যের মেয়র বা প্রকৃত শাসনকর্তা। পিঙ্গিন যখন ফ্রাঙ্ক রাজ্যের সিংহাসন অধিকার করেন তখন তিনি ছিলেন নিউস্ট্রীয়ার মেয়র। ময়সৌর গির্জায় বিখ্যাত ব্রিটিশ ধর্মযাজক বনিফিস তাঁর অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। ফলে ক্যারোলিং বংশ ফ্রাঙ্ক রাজ্যের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়।

৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে পিঙ্গিনের মৃত্যুর পর তাঁর বড় ছেলে চার্লস ফ্রাঙ্ক রাজ্যের সিংহাসনে বসেন। রাজা চার্লসই ইতিহাসে পবিত্র রোম সাম্রাজ্যের অধীশ্বর সম্রাট শার্লোমেন নামে বিখ্যাত হয়ে আছেন।

তিনিই গল্দেশের বর্বর উপজাতি-শাসনকে এক শার্লোমেন সভ্য রাজকীয় সাম্রাজ্যের রূপ দেন। খ্রীষ্টান ধর্মের সম্প্রসারণ, পোপের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় উৎসাহ দান প্রভৃতির মধ্য দিয়ে সম্রাট শার্লোমেন ইউরোপের অন্ধকার যুগের অবসান ঘটাবার পরিবেশ রচনা করে যান। এই জন্যই মধ্যযুগীয় ইউরোপের শ্রেষ্ঠ সম্রাট বলে শার্লোমেনকে চিহ্নিত করা হয়।

শার্লোমেন ছিলেন এক অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। সাহসী, চিন্তাশীল, উদার, জনপ্রিয় এবং কঠোর কর্তৃত্বপরায়ণ। রাষ্ট্র-পরিচালনার বিচক্ষণতার সঙ্গে কল্পনাপ্রবণতার মিশ্রণ ঘটেছিল তাঁর চরিত্রে। প্রবল বাস্তববুদ্ধি, প্রখর স্মৃতিশক্তি এবং দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি তাঁর চরিত্রকে ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন করেছিল।

তিনি কখনও কোন অসাধ্য সাধনের চেষ্টা করেন নি, তাঁর প্রজাদের ক্ষমতাবহির্ভূত কোন কাজে তিনি তাদের ঠেলে দেন নি। দীর্ঘকায়, শক্তিশালী শার্লোমেন ফ্রাঙ্ক উপজাতির প্রাচীন সংগীত ভালবাসতেন,

সবসময় ফ্রাঙ্ক উপজাতির ভাষায় কথা বলতে আর ফ্রাঙ্ক উপজাতির জাতীয় পোশাক পরতেন। ফলে ফ্রাঙ্ক যোদ্ধারা তাঁর প্রতি বিশেষ অনুগত ছিল। আচার-আচরণ অভ্যাসে পুরোপুরি ফ্রাঙ্ক উপজাতির রীতি-নীতি-ঐতিহ্য নির্ধারণ সঙ্গে অনুসরণ করলেও তিনি ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে রোমান ধর্মযাজকদের নির্দেশ পুরোপুরি মেনে চলতেন।

শার্লোমেন ফ্রাঙ্ক রাজ্যের সিংহাসনে বসবার অল্পকাল পরেই ইতালীর একজন লোম্বার্ড রাজা পোপের অধীনস্থ কিছু অঞ্চল অধিকার করেন। পোপ ফ্রাঙ্ক রাজা শার্লোমেনের সাহায্য চাইলে শার্লোমেন এক বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে ইতালী অভি-



শার্লোমেন

যান করেন এবং লোম্বার্ডরাজ দিদিয়ারকে পরাজিত ও সিংহাসনচ্যুত করে পোপের অধিকারভুক্ত রাজ্য উদ্ধার করেন। এই অভিযানকালে (৭৭৭ খ্রিঃ) তিনি রোমে উপস্থিত হলে রোমান গির্জা ভ্যাটিকানের যাজকেরা তাঁকে সাদর সম্বর্ধনা জানান। তখন শার্লোমেন মধ্য ইতালীর আরও কিছু অঞ্চল পোপকে দান করেন। এর ফলে রোমের যাজক সম্প্রদায়ের সঙ্গে শার্লোমেনের গভীর প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

৭৯১ খ্রীঃাব্দে পোপ তৃতীয় লিওর বিরুদ্ধে ঘুষ নেওয়া, ব্যভিচার এবং ধর্মের নামে শপথ গ্রহণ করে মিথ্যা বলার অভিযোগ এনে বিরুদ্ধ-পক্ষের লোকেরা তাঁকে রোমের রাজপথে মেয়ে ফেলবার চেষ্টা করলে তিনি সম্রাট শার্লোমেনের কাছে এসে তাঁর শরণাপন্ন হন।

বাইজান্টাইন সম্রাজ্ঞী ষষ্ঠ কনস্টানটাইন পোপের বিচার করবার
 অধিকার দাবি করলে ক্যাথলিক খ্রীষ্টান সমাজে
 রোম সম্রাটের
 পদে অভিষেক যে তুমুল আলোড়ন উপস্থিত হয় তার মীমাংসার
 জন্য শার্লোমেন আবার ৮০০ খ্রীষ্টাব্দে রোমে
 উপস্থিত হন। ২৩শে ডিসেম্বর পোপ তৃতীয় নিও সেন্ট পিটারের
 গির্জায় রোমান ও ফ্রাঙ্ক রাজকদের এক প্রতিনিধিগণ্ডলীর সামনে
 পবিত্র বাইবেল ছুঁয়ে নিজেকে নিরপরাধ বলে ঘোষণা করলে
 এই সংকটের অবসান হয়। দুই দিন পর, ৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে
 ডিসেম্বর খ্রীষ্টমাস প্রার্থনার পর শার্লোমেন গির্জার পবিত্র বেদীর সামনে
 নতজান্ন হয়ে ভক্তি নিবেদন করবার সময় পোপ তাঁর মাথায় রোমান
 সম্রাটের মুকুট পরিয়ে দিয়ে তাঁকে 'পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট'
 বলে ঘোষণা করেন। আবার পশ্চিম ইউরোপে একজন 'রোমান
 সম্রাট'-এর আবির্ভাব হয়।

এই অভিষেক ক্রিয়ার ভেতর দিয়ে শার্লোমেন কোন নূতন রাজ্য
 বা ধনসম্পদের অধিকারী হন নি সত্যি, কিন্তু সে যুগে এই অভিষেক
 ক্রিয়ার তাৎপর্য ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ। ইউরোপে তখন ছোটবড় অনেক
 রাজ্য ছিল, আর স্বাভাবিক ভাবেই তাদের ভেতর ক্রমাগত যুদ্ধবিগ্রহ
 চলে আসছিল। অত্যাধিক বাইজান্টাইন সম্রাটেরা
 অভিষেক ক্রিয়ার
 তাৎপর্য ক্রমাগত চেষ্টা করছিলেন ইউরোপের অতীত
 রোমান সাম্রাজ্যের সবটাই অধিকার করে নিজেদের
 ক্ষমতা বাড়াতে। এ ছাড়া, সে সময় উত্তর আফ্রিকা আর স্পেনে
 ইসলামের জয়পতাকা উড়ছে। কর্ডোভার খলিফারা সারা ইউরোপ
 জয় করে ইসলাম ধর্মকে এবং ইসলামী সাম্রাজ্যকে আরও সম্প্রসারণের
 চেষ্টা করছেন। স্পেনের দিক থেকে ইসলামী বাহিনীর আক্রমণ
 রুখবার জন্যে আর ইউরোপের মাটিতে ইসলাম ধর্মের সম্প্রসারণ বন্ধ
 করবার জন্যে দরকার ছিল এক শক্তিশালী ইউরোপীয় সাম্রাজ্যের।
 শার্লোমেনের সম্রাট হিসেবে অভিষেক সেই প্রয়োজন মিটিয়েছিল
 সেদিন এই অভিষেক ক্রিয়ার ভেতর দিয়ে রোমান গির্জার ক্ষমতা

ও সম্পদ বৃদ্ধির ফলে খ্রীষ্টধর্ম বিস্তার এবং শিক্ষার আলোক বিস্তারের কাজে অনেক সাহায্য হয়েছিল। তাই বলা যায় যে ইউরোপকে খ্রীষ্টধর্মের গীঠস্থান করে তুলতে এবং বর্বর জার্মান উপজাতির মানুষদের মধ্যে শিক্ষা ও জ্ঞানের আলো জ্বালাতে এই অভিষেকের ফল সুদূর-প্রসারী হয়েছিল।

সম্রাট শার্লোমেন ইউরোপে খ্রীষ্টধর্মের সম্প্রসারণের জন্য ৫৩টি অভিযান চালান এবং ডানিশ, স্লাভ, স্যাক্সন, আভার, ডালমিশিয়ান প্রভৃতি যে সব উপজাতি তখনও খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে নি তাদের একরকম জোর করেই ধর্মান্তরিত করেন। এইভাবে রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ইউরোপ জুড়ে খ্রীষ্টধর্ম রিস্তৃত হতে থাকে। শুধু তাই নয়, গির্জা ও মঠকে উদারভাবে ধনসম্পত্তি দান করে, পোপের রাজ্য সম্প্রসারণ করে তিনি গির্জা ও যাজক সম্প্রদায়ের শক্তি বৃদ্ধি করেন। মঠবাসী যাজকদের জীবনযাত্রা সুনিয়ন্ত্রিত করার উদ্যোগও তিনি গ্রহণ

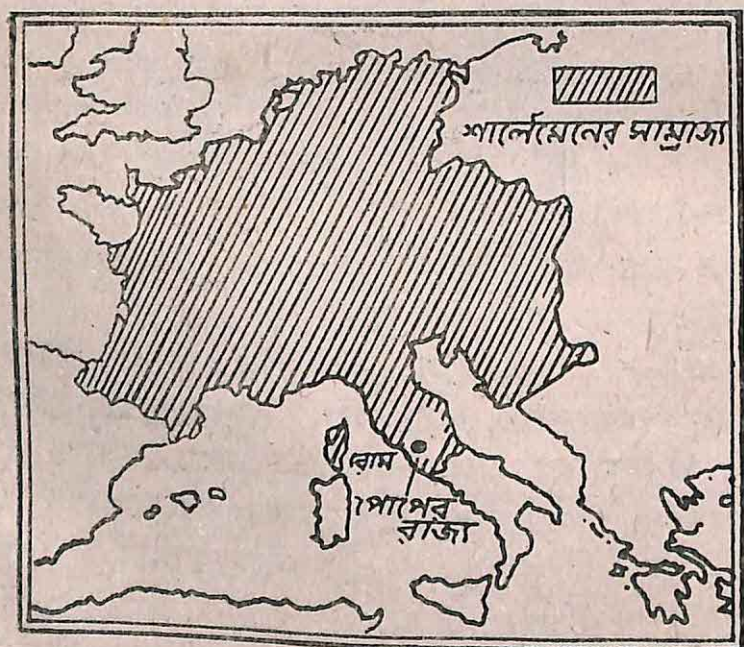
করেন। তাঁর রাজসভায় জ্ঞানীশুণী যাজকদের রাষ্ট্র ও গির্জার সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশি মর্যাদা দেওয়া হত, সবচেয়ে দায়িত্ব ও

সম্মানের পদে তাঁদের নিয়োগ করতে পারলে শার্লোমেন খুব আনন্দিত হতেন। এ প্রসঙ্গে খ্রীষ্টান ধর্মযাজক এ্যাংলেইন-এর নাম করা যায়। শার্লোমেনের রাজত্বেই ইউরোপে রাজশক্তির প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠার শক্তি ও ক্ষমতা রোমান গির্জা বা পোপ অর্জন করতে আরম্ভ করেন। যাজকেরা রাজার উপদেষ্টা ও ধর্মগুরুর আসনে অধিষ্ঠিত হন সম্রাট শার্লোমেনের যুগেই।

সম্রাট শার্লোমেনের সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব অজ্ঞ, নিরক্ষর, অন্ধকার ইউরোপে জ্ঞানের আলো জ্বেলে দেওয়া। জ্ঞান ও বিজ্ঞানচর্চা, সাহিত্য-চর্চা, ধর্মপুস্তক রচনা প্রভৃতি কার্যে তাঁর আগ্রহ, উৎসাহ এবং শিল্প সাহিত্য-সহযোগিতার ফলেই নিরক্ষর ও সংস্কৃতিক্ষেত্রে পিছিয়ে সংস্কৃতি বিকাশে পড়া জার্মান জনগোষ্ঠীর জীবনে নবজাগরণের সূত্রপাত গৃহপোষকতা হয়। তাই তাঁকে ক্যারো লিনীয় (Carolingian) নবজাগৃতির জন্মদাতা বলা হয়ে থাকে। অবশ্য একথা সত্য যে

মধ্যযুগের শেষভাগে, অর্থাৎ চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইউরোপের নবজাগৃতির তুলনায় ক্যারোলিঙ্গীয় নবজাগৃতি নিতান্তই তুচ্ছ। কারণ এই যুগের সাহিত্য-চর্চা বা পুস্তক-রচনা প্রধানতঃ বাইবেলের সঠিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং খ্রীষ্টান মতাদর্শের অতিরিক্ত কোন ভাব-ভাবনার প্রকাশ তাতে ছিল না। জ্ঞানচর্চায়, শিক্ষাদানে, লাতিন ভাষায় গ্রন্থ রচনায় উৎসাহদাতার প্রথম ভূমিকা শার্লোমেন সার্থকভাবে পালন করে গিয়েছেন।

সম্রাট শার্লোমেন তাঁর নানা সফল সামরিক অভিযানের ভেতর দিয়ে ইউরোপে যে বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন তা আয়তনে পশ্চিমী রোমান সাম্রাজ্যের প্রায় সমান হয়ে উঠেছিল। স্পেন, উত্তর আফ্রিকা, ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ আর ইতালী ছাড়া পশ্চিম ইউরোপের শার্লোমেনের রাজ্য—রোমান সাম্রাজ্যের বাকী অংশে তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়া তিনি রোমান সাম্রাজ্য-বহির্ভূত জার্মান অঞ্চলেও নিজ শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। দানিয়ুবের



পূর্ব তীরবর্তী কিছু অঞ্চলও তিনি নিজের অধীনে আনেন। ইতালীর

লোথার্ড রাজ্যে তাঁকে সম্রাট বলে স্বীকার করে তাঁর অনুগত হয়। তাঁর মৃত্যুর দুই বছর আগে প্রাচ্য রোমান সম্রাটও (বা বাইজান্টাইন সম্রাট) তাঁকে সম্রাট বলে স্বীকার করে সন্ধিচুক্তি প্রণয়ন করেন।

৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে শার্লমেনের মৃত্যুর পর তাঁর এই বিশাল সাম্রাজ্য মাত্র ষাট-পঁয়ষাট বছরের ভেতর টুকরো হয়ে যায়।

শার্লমেনের 'পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য' দীর্ঘস্থায়ী হয় নি বটে কিন্তু তাঁর কৃতিত্ব পৃথিবীর ইতিহাসে অমরীয় হয়ে আছে। ইউরোপের দু'কে খ্রীষ্টধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে এবং বর্বর জার্মান জাতির মধ্যে কৃতিত্ব শিক্ষাবিস্তার ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার আগ্রহ সৃষ্টি করে তিনি মধ্যযুগীয় ইউরোপের সভ্যতার বিকাশে যে চিরস্থায়ী অবদান রেখে গিয়েছেন, তা-ই তাঁর নাম ইউরোপের ইতিহাসে অমর করে রেখেছে।

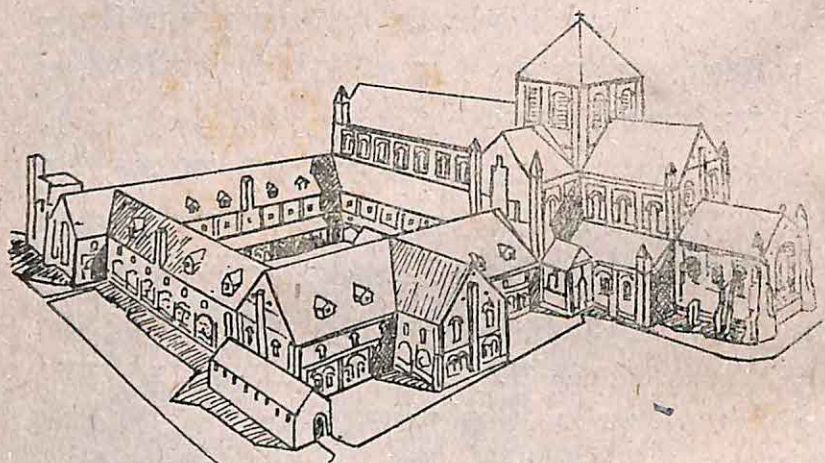
পঞ্চম শতাব্দী থেকে ইউরোপে খ্রীষ্টান সন্ন্যাসীদের মঠ গড়ে উঠতে থাকে। খ্রীষ্টান ধর্মের জীবনবিরোধী ভাব-ভাবনাই সম্ভবতঃ সন্ন্যাসী-দের মঠবাসী জীবনযাপনের প্রেরণা দিয়ে থাকবে। খ্রীষ্টান সন্ন্যাসীদের মঠ প্রাচীন মিশরে এবং পরবর্তিকালে ভারতে বৌদ্ধ-ধর্মের প্রভাবে সন্ন্যাসী-মঠের উদ্ভব হতে দেখা যায়।

সেই সব মঠের জন্ম হয়েছিল ধর্মীয় প্রধানদের উদ্যোগে। কিন্তু খ্রীষ্টান মঠের জন্মের পেছনে রোমান গির্জার প্রধানদের কোন নির্দেশ বা উদ্যোগ প্রথম অবস্থায় ছিল না। নবম-দশম শতাব্দী থেকে ক্যাথলিক খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের প্রধান পোপের উদ্যোগে এই সব মঠকে সুনির্দিষ্ট নিয়ম-শৃঙ্খলার এবং পোপের অধীন করা হয়।

লুসিয়ার সেন্ট বেনেডিক্ট (৪৮০-৫৪০) সর্বপ্রথম মঠজীবন সম্পর্কে কতকগুলো আদর্শ নিয়ম প্রণয়ন করেন। পরবর্তিকালে পশ্চিম ইউরোপের প্রায় সকল মঠই এই নিয়ম অনুসরণ করতে আরম্ভ করে। অবশেষে পোপের নির্দেশে প্রধানতঃ সেন্ট বেনেডিক্টের নিয়মাবলীই মঠজীবনের গঠন ও পরিচালনকে নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। এই নিয়ম-

বিধির মূল কথা এই যে, প্রত্যেক মঠে একজন নির্বাচিত মঠাধ্যক্ষ থাকবেন এবং মঠবাসী সন্ন্যাসীদের তাঁর নির্দেশ মেনে চলতে হবে। মঠের সন্ন্যাসীরা এক মঠ ছেড়ে অন্য মঠে যেতে পারবে না, নিষ্ঠার সঙ্গে সন্ন্যাসজীবন যাপন করতে হবে, সারাদিন মঠের কাজে, পড়াশোনায় আর ঈশ্বরের উপাসনায় কাটাতে হবে। সন্ন্যাসীদের কোন ব্যক্তিগত জিনিসপত্র থাকবে না। কিন্তু কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন করবার কোন নিয়ম সেন্ট বেনেডিক্ট রচনা করেন নি।

নবম শতাব্দী থেকে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপের প্রায় সমস্ত মঠগুলো সেন্ট বেনেডিক্ট-এর এই নিয়মবিধি অনুসরণে পরিচালিত হয়।



মধ্যযুগীয় মঠ

মন্ট ক্যাসিনোর মঠ সেন্ট বেনেডিক্ট জ্ঞানচর্চার 'যে' রীতির প্রচলন করেছিলেন, তার ফলেই সে যুগের মঠগুলিতে শিক্ষাদান কেন্দ্র ও বিদ্যাচর্চার পরিবেশ গড়ে ওঠে। এর ফলে মঠের সন্ন্যাসীরাই প্রাচীন জ্ঞানের সংরক্ষণ ও অন্বেষণ করে এবং প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডার এই পুঁথিগুলোকে অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করে। এই সব মঠে যে সব প্রাচীন পুঁথির পাণ্ডুলিপি লেখা হত সেগুলোই পরবর্তিকালে ইউরোপের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারা রক্ষা

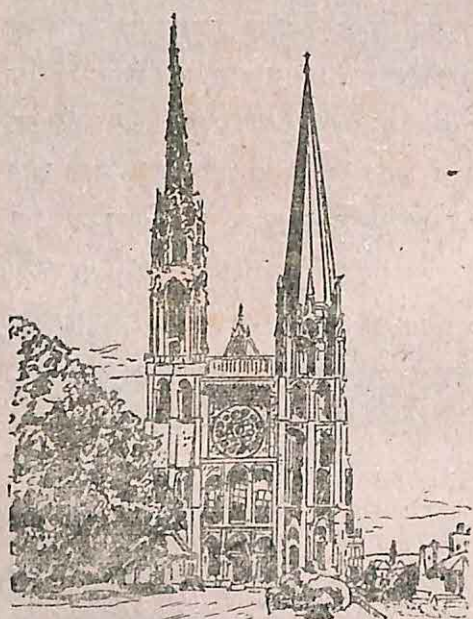
করতে সাহায্য করে। মন্ট-ক্যাসিনে, বক্সিও, রিচেনাউ সেন্ট গল, করভি, ফুলদা প্রভৃতি মধ্যযুগীয় মঠগুলো ইউরোপের শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অমূল্য অবদান রেখে গিয়েছে।

নবম শতাব্দীর প্রথম ভাগে সেন্ট বেনেডিক্ট-এর নির্দেশ অনুসরণ করে ফ্রান্সের পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত বার্গাণ্ডি রাজ্যের ক্লুনি নামে এক জায়গায় এক মঠ গড়ে ওঠে। এই মঠ থেকে সন্ন্যাসীদের মধ্যে পবিত্রতা, ধর্মতাব ও শৃঙ্খলাবদ্ধির এক প্রবল ক্লুনি : যম্-গির্জার আন্দোলন আরম্ভ হয়। শতাব্দীকালর ভেতর সংস্কার আন্দোলন

এই আন্দোলন মঠ ও গির্জার সংস্কার আন্দোলনের রূপ নেয়। ক্রমে এই আন্দোলন এক স্বাধীন ও স্বতন্ত্র গির্জার আন্দোলনে পরিণত হয়। এই আন্দোলনের মূল দাবি ছিল এই যে, পোপ হবেন রাজশক্তির উর্ধ্ব এবং গির্জা ও মঠ কেবলমাত্র তাঁর নির্দেশেই পরিচালিত হবে। যাজক সম্প্রদায়কে সং, নিলোভ এবং সন্ন্যাস জীবন যাপন করতে হবে, তাঁরা কেবলমাত্র গির্জা ও মঠের কাজে নিযুক্ত থাকবেন, সংসারী হতে পারবেন না, কোন রাজকীয় পদে নিযুক্ত থাকতে অথবা কোন রাজার আনুগত্য স্বীকার করে জমিদারী ভোগ করতে এবং রাজকার্যে সাহায্য করতে পারবেন না। পোপ নবম লিও এই নীতি সমর্থন করেন এবং সারা ইউরোপ জুড়ে যাজকসম্প্রদায় ও মঠগুলিকে এই নীতি মেনে চলতে নির্দেশ দেন। একাদশ শতাব্দীতে পোপ সপ্তম গ্রেগরী গির্জা, যাজক সম্প্রদায় ও মঠগুলোর ওপর পোপের চরম ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা এবং রোমান গির্জা ও যাজক সম্প্রদায়ের ওপর রাজকীয় আধিপত্যের সমস্ত সম্ভাবনা বন্ধ করবার জন্য এই ক্লুনি নীতি কঠোরভাবে কার্যকর করতে আরম্ভ করেন।

১০৭৫ খ্রীষ্টাব্দে লেন্ট উৎসবের সময় অনুষ্ঠিত রোমান যাজক সম্প্রদায়ের ধর্মসম্মেলন থেকে গির্জার কোন যাজককে রাজকীয় পদে নিযুক্ত করা বা রাজকীয় আনুগত্যের প্রতীক প্রদান করার প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়। এর ফলে পবিত্র রোমান সম্রাট চতুর্থ হেনরীর সঙ্গে পোপ সপ্তম গ্রেগরীর

প্রবল বিরোধ শুরু হয়। চতুর্থ হেনরী পোপের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন এবং পোপ সপ্তম গ্রেগরীর সেনাবাহিনীকে হারিয়ে তাঁকে বন্দী করে নির্বাসিত করেন। সপ্তম গ্রেগরী (হিন্ডব্র্যাণ্ড) ও চতুর্থ হেনরীর মৃত্যুর পরও এই বিরোধ চলতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত ১১২২ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ার্মস-এ উভয় পক্ষের মধ্যে অনুষ্ঠিত এক চুক্তির ফলে এই বিরোধের সমাপ্তি ঘটে। এই চুক্তিতে স্থির হয় যে, গির্জা বা মঠের অধিকারভুক্ত সম্পত্তির বিষয়ে রাজকীয় নির্দেশ মেনে চলতে যাজক



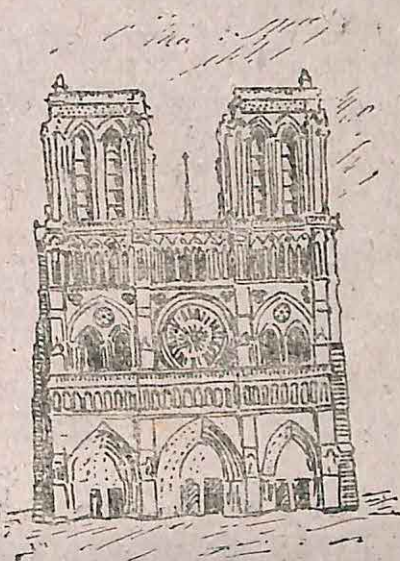
মধ্যযুগীয় গির্জা (রোমানেশ্ব নীতি)

সম্প্রদায় বাধ্য থাকবেন আর সম্রাট কোন মঠাধ্যক্ষ বা গির্জার প্রধানকে রাজকীয় প্রতীক ধারণ করে রাজার প্রতি আনুগত্য প্রকাশে বা কোন রাজকীয় কার্যে অংশগ্রহণে বাধ্য করতে পারবেন না। কিন্তু রাজা শক্তি আর যাজকশক্তির বিরোধ এখানেই মিটে যায় নি। পরবর্তিকালে

আবার এই বিরোধ প্রবলতর ভাবে আরম্ভ হয়ে ইউরোপের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে গুরুতর আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

নবম ও দশম শতাব্দীতে পশ্চিম ইউরোপ জুড়ে খ্রীষ্টান মঠগুলোতে মঠের বিদ্যালয় বিদ্যাচর্চার যে ব্যাপক প্রসার শুরু হয় তার থেকে বিশ্ববিদ্যালয় ফলেই একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে ইউরোপের নানা জায়গায় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্র হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে

উঠতে থাকে। রোমান অভিজাত সম্প্রদায়ের মতো জার্মান অভিজাত শ্রেণী, অর্থাৎ রাজা, রাজবংশীয় লোক, সামন্ত-জমিদার প্রভৃতির ভেতর বিদ্ভাচচার একেবারেই প্রচলন ছিল না। মধ্যযুগীয় সামন্ত-অভিজাত শ্রেণী কেবল যুদ্ধবিগ্রহ, শিকার, যুদ্ধকৌড় এসব নিয়েই দিন কাটাতো। লেখাপড়া শিখে বিদ্ভাচচার প্রচলন ছিল কেবল যাজক সম্প্রদায়ের মধ্যে। সম্রাট শার্লোমেন সর্বপ্রথম তাঁর প্রজাদের শিক্ষাদানের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ক্রমে ইউরোপ জুড়ে জ্ঞানপিপাসু শিক্ষার্থীর এবং জ্ঞানবুদ্ধ শিক্ষকদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। দলে দলে ছাত্র জ্ঞানলাভের জন্য সে যুগে নামী নামী জ্ঞানী পণ্ডিতদের কাছে পাঠ নেবার জন্য ভীড় করতে থাকে। ক্রমে সে সব অঞ্চলে বিশ্ববিদ্যালয়ের আবির্ভাব হয়।



মধ্যযুগীয় গির্জা (গথিক রীতি)

গির্জা আর মঠের উদ্যোগেই বেশির ভাগ বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল সে সময়। কোন এলাকায় কোন লোককে শিক্ষাদানের কাজ করতে হলে সে এলাকার গির্জার প্রধানের কাছ থেকে অনুমোদনপত্র নিতে হত। প্রধানতঃ ইউরোপের উত্তরাঞ্চলের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো গির্জা ও মঠের প্রভাবে বা উদ্যোগে গড়ে ওঠে। এদের ভেতর প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় সে যুগে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় সবচেয়ে বিখ্যাত ছিল। শিক্ষকেরা এক সংঘ তৈরি করে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের সূত্রপাত করেন। সে যুগের বিখ্যাত দার্শনিক আবেরল্ড, সেন্ট টমাস অ্যাকুইনাস, আলবের্টাস ম্যাগনাস প্রভৃতি প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করতেন। প্যারিস

বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম কলাবিদ্যা ও ধর্ম-দর্শন পড়ানো হত, পরে তর্কবিদ্যা, আইন প্রভৃতি পড়ানো আরম্ভ হয়।

বোলোনা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এক ছাত্র-সংঘের দ্বারা। তারা শিক্ষকদের ভাড়া করে আনতো পাঠদানের জন্য। আইন-শাস্ত্র শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে সে যুগে বোলানো বিশ্ববিদ্যালয় প্রসিদ্ধ ছিল। ইতালীতে যাজক সম্প্রদায়ের বোলানো প্রভাব থেকে মুক্ত যে বিশ্ববিদ্যালয়টি খুব খ্যাতিলাভ করেছিল, সেটি হল সালের্নো কোর্ড, কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাশাস্ত্র পড়ানো হত। এজেন্টই এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রসিদ্ধিলাভ করে। দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে (১১৬৭-৬৮ খ্রীঃ) ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় হেনরির আদেশে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিরাট সংখ্যক ইংরেজ শিক্ষক ও ছাত্র স্বদেশে ফিরে আসে। যতদূর মনে হয়, এইসব ছাত্র আর শিক্ষকেরাই অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। ১২০৯ খ্রীষ্টাব্দে অক্সফোর্ডের একদল ছাত্র ও শিক্ষক কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের মতোই অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ছিলেন বিশপ কর্তৃক নিযুক্ত একজন পরিচালক। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের মতোই এখানেও চারটি বিভাগ এবং চারজন প্রোফেসর বা পরিদর্শক ছিলেন। এখানেও প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের মত আবাসিক কলেজ গড়ে ওঠে। এই দুটি বিশ্ববিদ্যালয় সে যুগে সারা ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিখ্যাত ছিল। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়েও দর্শন, সাহিত্য, ধর্মশাস্ত্র, আর তর্কবিদ্যা পড়ানো হত।

একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর ইউরোপে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আবির্ভাবের ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার যে উদ্যোগ শুরু হয় তাকেই দ্বাদশ শতাব্দীর নবজাগৃতি বলা হয়।

অনুশীলনী

১। কোন্ জার্মান উপজাতি রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর গলদেশে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে? এদের নেতা কে ছিলেন? কখন তিনি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন?

২। রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর কাকে 'পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের' সম্রাট বলে ঘোষণা করা হয়? ক, কবে, কোন্ অঙ্গুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে এই ঘোষণা করেন? এর ফল কি হয়েছিল?

৩। শার্লমেন কে ছিলেন? মধ্যযুগীয় ইউরোপের ইতিহাসে তিনি কেন বিখ্যাত হয়ে আছেন? তাঁর চরিত্র বর্ণনা কর।

৪। ক্যারোলিঙ্গীয় নবজাগৃতির যুগ কোন্ সময়কে বলা হয়? একথা বলার কারণ কি?

৫। মঠ কাকে বলা হত? মঠ-জীবনের উন্নতি-বিকাশে সেন্ট বেনেডিক্ট-এর অবদান আলোচনা কর।

৬। কুনি কি? কুনি থেকে দশম শতাব্দীতে কোন্ আন্দোলনের সূত্রপাত হয়? এর ফল কি হয়েছিল?

৭। ইউরোপে একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে মঠ থেকে কিভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভব হয় তা সংক্ষেপে লিখ।

৮। টীকা লিখ—(ক) সেন্ট বেনেডিক্ট; (খ) আবুলাউ; (গ) সেন্ট টমাস একুইনাস; (ঘ) অক্সফোর্ড ও প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়; (ঙ) পোপ তৃতীয় লিও; (চ) সপ্তম গ্রেগরী।

৯। এক স্থানীয় উত্তর দাও:—

(ক) কে প্রথম ফ্রাঙ্করাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন? (খ) ক্যারোলিঙ্গ বংশের কোন্ ব্যক্তি ক্রাঙ্ক রাজ্যের সিংহাসন অধিকার করেন? (গ) শার্লমেনের প্রকৃত নাম কি? (ঘ) কোন্ খ্রীষ্টকে তাঁকে 'পবিত্র রোমান সম্রাট' বলে অভিষেক করা হয়? (ঙ) 'ক্যারোলিঙ্গীয় নবজাগৃতি'র সন্মততা কে? (চ) বোলোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কারা প্রতিষ্ঠা করে? (ছ) ইতালিয় শার্লমেন বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন্ শাস্ত্র পড়ানো হত? (জ) মধ্যযুগে খ্রীষ্টান সন্ন্যাসীদের ভেতর পবিত্রতা, ধর্মতাব ও শৃঙ্খলাবৃদ্ধির আন্দোলনের নাম কি?

সপ্তম অধ্যায়

অধ্যায়গীয়া ইউরোপের সামন্ততন্ত্র

[সংক্ষিপ্তসার :—বর্বরদের অভিযানের ফলে ইউরোপের অসংখ্যটি রোমান সাম্রাজ্যের পতনে সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে যে শূন্যতা দেখা দেয় তা পূরণ করার জন্য যে সামাজিক, অর্থনৈতিক সংগঠনের উদ্ভব হয়, তাকেই বলা হয় সামন্ততন্ত্র। সামন্ততন্ত্রের মূল কথা হল রাজ্যের সমস্ত জমি রাজ্য অধিকারকারী উপজাতি-প্রধানের শক্তিশালী অধীশ্বরদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে, তারা আবার তাদের সম্পত্তি তাদের বোদ্ধাদের মধ্যে ভাগ করে দেবে। বিনিময়ে এইসব বোদ্ধারা তাদের সর্দারদের সঙ্গে যুদ্ধে যাবে আর সর্দাররা রাজা বা উপজাতি প্রধানকে যুদ্ধের সময় সৈন্য যোগাবে। এই সব জমিতে বসবাসকারী কৃষকেরা চিরকালের জন্য বংশাঙ্কুরে জমি চাষ করবে আর তাদের প্রভু সর্দারদের ফসলে খাজনা দেবে, প্রভুর ইচ্ছা অনুযায়ী বিনা বেতনে তার ব্যক্তিগত জমি চাষ করবে, সব প্রয়োজনীয় জিনিস বানিয়ে দেবে, প্রভুর পরিবারের সেবা করবে। জমির ওপর সামন্ত প্রভুর মালিকানা আর সমস্ত উৎপাদনকার্যে ক্রীতদাসদের বদলে আধা-স্বাধীন কৃষিদাসদের প্রাধান্য সামন্ততন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই ব্যবস্থার ফলে ইউরোপে যে যুদ্ধ ব্যবসায়ী অভিজাত শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছিল তারা মধ্যযুগীয় ইউরোপকে মুসলমান, উত্তর অঞ্চলের বর্বর তাইকিং এবং পূর্বদেশের বায়াবর মজর উপজাতির অভিযান থেকেও ইউরোপের নতুন শাসন ও সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে রক্ষা করেছিল আর, এই সামন্ততন্ত্রের আধিপত্যের ফলেই পাঁচশো বছর ধরে ইউরোপের রাষ্ট্রশক্তি নিজ নিজ রাজ্যের ওপর চূড়ান্ত কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছিল।]

রোমান সাম্রাজ্য পশ্চিম ইউরোপের মাটি থেকে নিশ্চিহ্ন হবার পাঁচ শো বছরের ভেতর রোমান সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভূমিকা

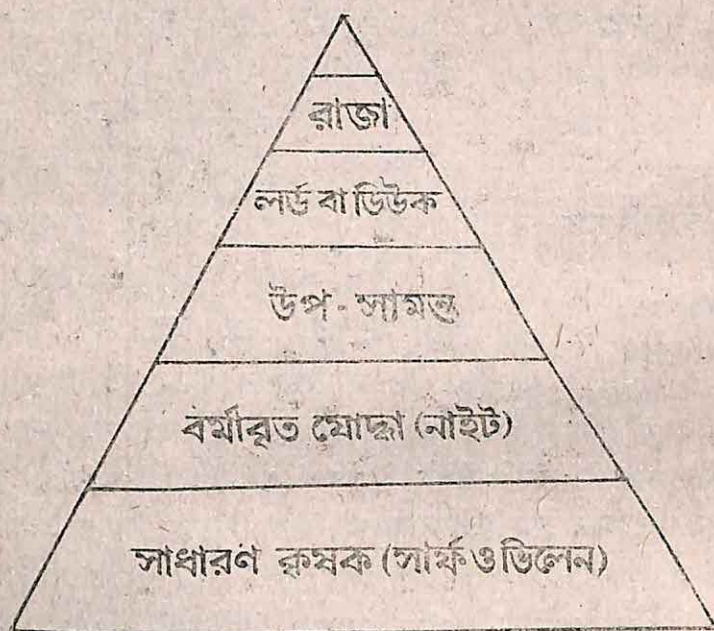
ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়। এই পরিবর্তিত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক, ব্যবস্থাকেই সামন্ততন্ত্র বলা হয়ে থাকে। রোমানযুগের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে এর প্রভেদ অনেক। সমাজ-ব্যবস্থার এই আমূল পরিবর্তনের ফলেই ক্রমে ইউরোপের সভ্যতা-সংস্কৃতি রোমান

সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রবল প্রভাব অতিক্রম করে এবং নূতন সংস্কৃতি-সভ্যতার ধারা গড়ে তুলতে পেরেছিল।

এক শক্তিশালী শাসনব্যবস্থা ইউরোপ জুড়ে গড়ে উঠেছিল রোমান যুগে সম্রাট অভিজাতবংশীয় অল্পসংখ্যক লোকের মারফত ভাড়াটে সেনাবাহিনীর সাহায্যে শাসন পরিচালনা করতেন। বিশাল রোমান সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে রোমান সেনাবাহিনী খাদ্যশস্ত্র, সোনারূপা, মণিমুক্তা প্রভৃতি যে প্রচুর ধনসম্পদ সংগ্রহ করে আনতো, তাই সম্রাটের ও তাঁর অভিজাত অনুচরদের বিলাসজীবনের রসদ যোগাতো, সেনাবাহিনীর খরচ মেটাতো। বর্বরদের অভিযানের ফলে রোম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে আলাদা আলাদা যে সব রাষ্ট্র গড়ে উঠলো তাদের প্রধান বর্বর উপজাতিগুলোর নেতাদের সেরকম ধনসম্পদ পাওয়ার কোন উপায় ছিল না। কিন্তু প্রত্যেক উপজাতি-প্রধান যে সামন্ততন্ত্রের সমস্ত বার্ষিক সব গোষ্ঠী সর্দারদের নেতা ছিল, সেই সর্দারদের ও তাদের অধীন সৈন্যদের খরচ মেটাবার ব্যবস্থা করার ওপরেই তখন উপজাতি নেতাদের প্রাধান্য নির্ভর করতো। সেই ‘অন্ধকার যুগে’ পশ্চিম ইউরোপ জুড়ে রোমান যুগের টাকা-পয়সায় কেনাবেচার অর্থব্যবস্থা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, শিল্প উৎপাদন খুব কমে গিয়েছিল। তাই খেয়ে-দেয়ে বেঁচে থাকবার জন্তে দেশত্যাগী বর্বর উপজাতিগুলোর প্রধান প্রয়োজন ছিল জমি। জমিই ছিল তাদের কাছে সবচেয়ে দামী জিনিস,—টাকা-পয়সা, পোশাক-পরিচ্ছদের দাম তাদের কাছে ছিল খুব কম। তাই তারা রাজা বা উপজাতি-প্রধানকে যুদ্ধে সাহায্য করতো জমির বদলে। ফলে ইউরোপে এক নূতন জমি-মালিকানার ব্যবস্থার জন্ম হয়েছিল। একেই সামন্ততন্ত্র বলা হয়।

বর্বর জার্মানরা পূর্ব ইউরোপের বাসভূমি ছেড়ে পশ্চিম ইউরোপের নূতন দেশে এসে গোষ্ঠী-সর্দারদের অধীন প্রজায় পরিণত হয়। এর আগেকার বর্বর সমাজে জমি ব্যক্তি-মালিকানার অধীন ছিল না,

জমি ছিল সমাজিক সম্পত্তি। সবাই মিলে বনজঙ্গল সাফ করে চাষের জমি তৈরি করতো, তারপর প্রতি সামন্ত ব্যক্তির পরিবার তার প্রয়োজন অনুযায়ী জমি চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করতো। কিন্তু নূতন দেশে জমির মালিক হল তাদের উপজাতি-প্রধান বা রাজা। রাজার কাছ থেকে জমিভোগের অধিকার পেল সর্দারেরা, আর তারা আবার



সামন্ত ব্যবস্থার গঠন

নির্দিষ্ট শাস্ত্রের ভাগ, তাদের অধীনে সৈনিক হিসাবে কাজ করার শর্ত আরোপ করে সাধারণ শ্রমজীবীদের জমি ছেড়ে দিল চাষবাসের জন্য। এইভাবেই সামন্ত-ব্যবস্থা গড়ে উঠলো। এই সামন্ত-ব্যবস্থার শীর্ষে ছিলেন রাজা, তার পরেই লর্ড বা ডিউকেরা, যারা রাজার কাছ থেকে বড় বড় জমিদারী ভোগের সুযোগ পেতেন। এই সব লর্ডেরা আবার তাঁদের বড় বড় জমিদারীর অংশবিশেষ তাঁদের অনুচরদের ভোগ করতে দিতেন। এরা ছিল লর্ডদের অধীন উপ-সামন্ত। এরা আবার

নিজেদের জমিদারীর ছোট ছোট অংশ ভোগের অধিকার দিতেন বর্মান্বত অস্বারোহী যোদ্ধা বা নাইটদের। এই নাইটেরা হতেন উপ-সামন্তদের অধীন। সামন্ত-ব্যবস্থার গঠনটা তাই ছিল অনেকটা পিরামিডের মত। এই পিরামিডের চূড়ায় হলেন রাজা আর সব নীচে সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ। এইসব শ্রমজীবী মানুষের অধিকাংশ ছিল চাষী, খুব সামান্য অংশ ছিল কারিগর, কুটার শিল্পী আর সামন্ত প্রভুদের সেবক ভৃত্য। এরাই সামন্ত প্রভুদের খাত্ত পোশাক যোগাতো, তাদের সৈন্য হিসেবে যুদ্ধ করে তাদের প্রভু বজায় রাখতো, তাদের জমিজমা-সম্পত্তি দেখাশোনা করতো। এদের ভেতর থেকেই সামন্ত জমিদারেরা তাঁদের শাসন ও শোষণের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মচারী সংগ্রহ করতো।

সামন্ত জমিদারদের আবার তাদের প্রভুর প্রতি, অর্থাৎ যাঁর কাছ থেকে তারা জমিদারী ভোগের অধিকার পেয়েছে তাঁদের প্রতি অঙ্গুগত থাকতে হত। প্রত্যেক সামন্তকে প্রভুর নির্দেশ অনুযায়ী সৈন্যসামন্ত নিয়ে প্রভুর সাহায্যের জন্য উপস্থিত থাকতে হত। প্রভু বন্দী হলে মুক্তিপণের জন্য সামন্তদের টাকা দিতে হত, প্রভুর মেয়ের বিয়েতে, প্রভুপুত্রের নাইট-গৌরব লাভের সময় সামন্তদের উপহার দিতে হত, প্রভুর বিচারালয়ে বিচারকার্যে সাহায্য করতেও সামন্তরা বাধ্য থাকতো। এ সব কর্তব্যপালন না করলে প্রভু তার কাছ থেকে জমিদারী কেড়ে নেবার অধিকারী ছিলেন।

এই সব সামন্তদের জমির এক অংশ তাদের প্রত্যক্ষ অধীন থাকতো আর ভূমিদাসেরা বিনা পারিশ্রমিকে এই জমি চাষ করতো। আর বাকী অংশ কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা হত এবং তার জন্য সামন্ত জমিদাররা খাজনা আদায় করতো।

সামন্ত-প্রথা শক্তিশালী হতে আরম্ভ করলে সামন্ত জমিদারেরা নিজেদের এলাকার পুরোপুরি মালিক হয়ে বসলো। প্রত্যেক-সামন্ত-ভূস্বামী তার অধীনস্থ এলাকার শাসন ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষার কাজ নিজের হাতে নিয়ে নিল। তখনকার দিনের ইউরোপে এক

অঞ্চল থেকে অল্প অঞ্চলে বাতায়াতের খুব অনুবিধা দেখা দিয়েছিল।

রাস্তা-ঘাট ছিল না, লুঠেরা-ডাকাতের খুব
নামস্ফরায়ী আধিপত্য ছিল, আইন শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষমতাও
আঞ্চলিক রাজার ছিল না। তাই রাজধানী থেকে দূরে রাজ্যের
শাসনকর্তা অত্যাঁচ অঞ্চলে রাজার ক্ষমতা কার্যকর করা যেতো

না। সেই সুযোগেই প্রথম সামন্তরা নিজ নিজ অঞ্চলে কার্যতঃ স্বাধীন
শাসন-ব্যবস্থা প্রচলন করে। পরবর্তিকালে সারা ইউরোপেই সামন্তদের
এই অধিকার স্বীকৃত হয় যে তাদের জমিদারীর ভেতর শাসনকার্য
আর আইন শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যবস্থা তাদের হাতেই থাকবে,—রাজা
তাতে বাধা দিতে পারবেন না। এইভাবে সামন্ত ভূস্বামীরা প্রকৃতপক্ষে
নিজ নিজ অঞ্চলের স্বাধীন শাসনকর্তা হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রেই মধ্য-
যুগীয় ইউরোপে রাজ্যের ওপর রাজাদের কর্তৃত্ব ছিল শিথিল।
শার্লমেন প্রমুখ কয়েকজন প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন রাজা ছাড়া অধিকাংশ
রাজাকেই সামন্ত-ভূস্বামীদের হাতের পুতুল হয়ে থাকতে হত। এ
ছাড়া, সামন্ত-প্রথার রীতি অনুযায়ী রাজার কাছ থেকে জমি ভোগের
অধিকারী সামন্তদের অধীন ছোট ছোট সামন্ত জমিদাররা রাজার
প্রতি আনুগত্য প্রকাশে বাধ্য ছিল না। তাই রাজার প্রত্যক্ষ আনুগত্য
সামন্তরা অনেক সময় রাজাকে তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী চলতে বাধা
করবার জন্য তাদের অধীনস্থ সামন্ত জমিদারদের বিদ্রোহে প্ররোচিত
করতো। ফলে রাজারা তাঁদের অধীনস্থ রাজ্যের সকল প্রজার ওপর
প্রভুত্ব করতে পারিতেন না।

বর্বরদের ইউরোপ অভিযানের ফলে রোমান সাম্রাজ্য ভেঙে
পড়ার পর পশ্চিম ইউরোপে বর্বর জার্মান উপজাতিগুলো যে সব
রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল, দশম-একাদশ শতাব্দীতে
নামস্ফরায়ী তুর্গ তাদের এক ভীষণ বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। এই
এক বর্ষাবৃত্ত বিপদ হল হাঙ্গেরিয়ান, ভাইকিং মুসলমানদের
বাহিনীর দান আক্রমণ। এইসব আক্রমণের একমাত্র লক্ষ্য
ছিল পশ্চিম ইউরোপে গ্রাম শহর লুণ্ঠন আর নরহত্যা। অধিবাসীদের

ধরে নিয়ে গিয়ে এশিয়ার মুসলমান রাজ্যগুলোতে অথবা বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের শহরে-বন্দরে ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রী করা হতো। এদের আক্রমণের ফলে পশ্চিম ইউরোপের নানা সমৃদ্ধ অঞ্চল, সমুদ্রতীরের গ্রাম-শহর জনশূন্য হয়ে গিয়েছিল। সামন্ত-ভূস্বামীরা যে সব সুরক্ষিত দুর্গ তৈরি করেছিল নিজেদের বসবাসের জন্য, সেগুলোই কেবল এদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে পেরেছিল। এইসব যাযাবরদের প্রবল অভিযানের গতি এভাবেই প্রথম প্রতিহত হয়।

এরপর বর্মান্বিত যোদ্ধা বা নাইটরা এই সব যাযাবরদের বাহিনীর বিপক্ষে সংগঠিত অভিযান আরম্ভ করলে ক্রমে ক্রমে এদের আক্রমণের তীব্রতা কমে থাকে। নানা সামন্তরা মুসলমানদের সিসিলি থেকে তাড়িয়ে দিয়ে সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে তাদের আক্রমণ বন্ধ করে, ইংলণ্ডে শ্রাকসন নাইটরা নরওয়ের ভাইকিংদের বিরুদ্ধে প্রবল সফল অভিযান চালিয়ে তাদের



মধ্যযুগীয় নাইট

আক্রমণের তীব্রতা হ্রাস করে। এভাবেই মধ্যযুগীয় ইউরোপে স্থায়ী আর শান্তিপূর্ণ রাষ্ট্র গঠনের চেষ্টায় যাযাবর অভিযানকারীদের বাধা দূর হয়েছিল। কাজেই, ইউরোপের রাজনৈতিক জীবনধারণের বিকাশে সামন্ততন্ত্রের এই অবদান তুচ্ছ করার নয়।

ফ্রাঙ্ক-রাজ চার্লস মার্টেল ৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে টুস-এর যুদ্ধে মুসলমান অশ্বারোহী যোদ্ধাদের যুদ্ধকৌশল দেখে এক সশস্ত্র অশ্বারোহী বাহিনী তৈরি করেন আর তাদের বড় বড় জমিদারীর মালিকানা

দেন এই শর্তে যে তারা যুদ্ধের সময় তাঁর সাহস্ৰতন্ত্র : নুংন
সার্ক বা ভূমিদান পক্ষে লড়াই করবে। এই ভাবেই ইউরোপে সর্ব

প্রথম সামন্ত ব্যবস্থার সূত্রপাত হয়। তিনশো বছরের ভেতর পশ্চিম ইউরোপ জুড়ে এই ব্যবস্থা স্থায়ী আকার লাভ করে এবং ক্রমে ক্রমে সামন্ততন্ত্র রোমান সমাজব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে এক নূতন সমাজব্যবস্থার রূপ নেয়। এই ব্যবস্থা একদিকে রাজা আর তাঁর সেনাপতিদের মধ্যে এক নূতন সম্পর্ক গড়ে তোলে। বেতনের পরিবর্তে সেনাপতির জমিদারীভোগের অধিকার পেল আর তার জগ্ন তারা রাজার সৈন্য যোগাবার আর সৈন্য পরিচালনা করবার জগ্ন অঙ্গীকারবদ্ধ হল। এই ব্যবস্থা ক্রমে হয়ে উঠলো বংশগত, আর “জমিদার ছাড়া জমি নেই, জমি ছাড়া জমিদার নেই” এই নীতি হয়ে উঠলো প্রবাদবাক্য। জমির সঙ্গে কৃষকও বাঁধা পড়লো জমিদারের কাছে, স্বাধীন কৃষকের অস্তিত্ব লোপ পেয়ে গেল।

ইউরোপের গ্রামাঞ্চলে সামন্তদের দুর্গ-প্রাসাদ গড়ে উঠলো, রোমান যুগের নগরবাসী অভিজাত সম্প্রদায়ের জায়গা অধিকার করলো গ্রামবাসী সামন্ত-ভূস্বামী। এদের জমিদারীতে রাজার আইন বা রাজার কর্তৃত্ব লোপ পেল, কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থার বদলে গড়ে উঠলো আঞ্চলিক শাসনব্যবস্থা। একই রাজা বা সম্রাটের অধীন রাজ্যসীমার মধ্যে অসংখ্য কার্যতঃ স্বাধীন এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির শাসনব্যবস্থা গড়ে উঠলো। রোমান যুগের শহরমুখা এবং কেন্দ্রীভূত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গেল ভেঙে, গড়ে উঠলো অসংখ্য অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক অঞ্চল,—যাদের ভেতর সহযোগিতার চেয়ে সংঘর্ষ আর লড়াই প্রাধান্য পেল জার্মান বা টিউটন জাতিগোষ্ঠীর নান উপজাতির ছোট-বড় রাজ্য নিয়ে গড়ে উঠলো নূতন ইউরোপ। ক্যাথলিক খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের প্রধান পোপ পবিত্র রোমান

সাম্রাজ্যকে' নূতন করে গড়ে তুলবার চেষ্টায় তাই পুরোপুরি ব্যর্থ হলেন।

রোমান যুগের বড় বড় নগর আর নাগরিক জীবনযাত্রা ইউরোপের বুক থেকে মিলিয়ে গেল, বিলাসী, শিল্পরসিক, শিক্ষানুরাগী রোমান অভিজাত শ্রেণীর পরিবর্তে যুদ্ধপ্রিয়, ভোজনপটু, নিরক্ষর সামন্তশ্রেণী ইউরোপের প্রভু হয়ে উঠলো।

রোমান যুগের দেশব্যাপী ব্যবসা-বাণিজ্য লোপ পেল, সঙ্গে সঙ্গে বিদ্বান বণিকশ্রেণীও লুপ্ত হয়ে গেল। শুধুমাত্র গির্জা আর মঠের ভেতর যাজকসম্প্রদায়ের শিল্প-সংস্কৃতি-শিক্ষার ধারাকে বাঁচিয়ে রাখলেন, বাঁচিয়ে রাখলেন সারা ইউরোপের ঐক্যভাবনাকে ক্যাথলিক ধর্ম-সম্প্রদায়ের একতার আদর্শের ভেতর দিয়ে। পরবর্তিকালে ইউরোপে নানা জাতির উদ্ভব ও উগ্র জাতীয়তাবোধের আবির্ভাবের ভিত্তি রচনা করলো এই নূতন সমাজব্যবস্থা,—সামন্ততন্ত্র।

সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ফলে বিভিন্ন রাজ্যের কেন্দ্রীয় শক্তি দুর্বল হলেও রাজ্যগুলির অস্তিত্ব কিন্তু বিলুপ্ত হয় নি। এর কারণ হল এই যে এই ব্যবস্থা এক নূতন নীতিবোধের জন্ম দিয়েছিল, যাকে ইংরেজী ভাষায় **শিভ্যালারি** বলা হয়। বাংলায় একে আমরা **বীরধর্ম**

বলতে পারি। এই নীতিবোধের মূলকথা হল
শিভ্যালারি বা বীরধর্ম রাজার প্রতি আনুগত্য আর বীরত্ব। এই সমাজ-

ব্যবস্থা যে অভিজাত সম্প্রদায়ের জন্ম দিয়েছিল তারা যুদ্ধবিজয় খুব পারদর্শী হয়ে উঠেছিল। ঘোড়ায় চড়ে, ইস্পাতের বর্ম সারা শরীর ঢেকে, মস্তোবড় ঢাল, লম্বা বর্শা, তরোয়াল আর ভারী কুড়ুল বা টাঙ্গি নিয়ে তারা যুদ্ধ করতো এবং তাদের প্রভুর জ্ঞাত প্রাণ দেওয়াকে তারা সবচেয়ে গৌরবের বিষয় বলে মনে করতো। খ্রীষ্টধর্মে বিশ্বাস, প্রভুভক্তি, সত্যবাদিতা, সততা প্রভৃতি গুণকে তারা জীবনের আদর্শ বলে মনে করতো। যুদ্ধে পরাজয় বা অসম্মানের চেয়ে মৃত্যু তাদের কাছে অনেক বেশি গৌরবের বিষয় ছিল। এই সব গুণের অনুশীলনকেই মধ্যযুগের সামন্ত-অভিজাত শ্রেণী বীরধর্ম

বলে বিশ্বাস করতো, আর এই মহান আদর্শ অনুসরণের প্রেরণাতেই সে যুগের সামন্তশ্রেণী তাদের জমিদানকারী রাজা বা প্রভুর প্রতি সারাজীবন অনুগত থাকতো।

এইসব নাইটদের কথা, যুদ্ধে তাদের শৌর্যবীর্যের নানা রোমাঞ্চকর ঘটনা অবলম্বন করে তাতে কল্পনার রং চড়িয়ে বীরগাথা বা বীরত্ব কাহিনীমূলক সংগীত রচনা করে সে যুগে একদল মানুষ গেয়ে বেড়াতো। রাজসভায়, যুদ্ধযাত্রার শুরুতে, সামন্ত-চারণ কবি

ভূস্বামীদের দুর্গের ভোজসভায়, সামন্ত-অভিজাতদের অস্ত্রপরীক্ষার আসরে এরা এসব গান শুনিতে যুদ্ধপ্রিয় সামন্তদের আনন্দ দিত, উত্তেজিত করতো, আর বীরধর্মের আদর্শ অনুসরণের প্রেরণা যোগাতো। ইউরোপে এদের বলা হত *ট্রুভেডার*। বাংলা ভাষায় এদের চারণ কবি বলা যেতে পারে। ভারতেও এই ধরনের বীরগাথা রচয়িতা চারণ-কবিদের আবির্ভাব ঘটেছিল নবম-দশম শতাব্দীতে। এদের রচিত বীরগাথা থেকেই রাজপুতদের বীরত্ব-কাহিনী আমরা পরে জানতে পেরেছি। সে সময় সারা ইউরোপ জুড়ে এই সব চারণ-কবিদের খুব সম্মান ও মর্যাদা ছিল, কারণ তাদের মুখে মুখেই সামন্ত-অভিজাতদের বীরধর্মের কথা প্রচারিত হত। এরাই সাধারণ মানুষ, অর্থাৎ ভূমিদাস কৃষকদের মধ্যেও প্রভুভক্তি, আনুগত্য, যুদ্ধপ্রিয়তা, সততা, সত্যবাদিতা, খ্রীষ্টধর্মের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব জাগিয়ে তুলতো এসব বীরগাথার ভেতর দিয়ে। অতদিকে যে সব সামন্ত-জমিদার, রাজা বা সম্রাট বীরধর্মের আদর্শ থেকে সরে যেতেন, তাদের কুকীর্তির পরিচয় দেশের নানাস্থানে গেয়ে বেড়াতেও এই সব চারণেরা দ্বিধা করতো না। তাই বলা যেতে পারে যে মধ্যযুগের ইউরোপে সামন্ত-অভিজাত শ্রেণীকে বীরধর্মের আদর্শ মেনে চলতে বাধ্য করে চারণ-কবির। সেই অন্ধকার যুগে নীতি ও ধর্মাদর্শের প্রভাব বাড়ার এবং ছড়িয়ে দেবার কাজে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

সামন্ততন্ত্রের অর্থনৈতিক কাঠামো হল ম্যানর-ব্যবস্থা। এর সঙ্গে আনাদের দেশে অষ্টাদশ শতাব্দীর জমিদারী প্রথাও অল্পবিস্তর তুলনা

চলতে পারে। ম্যানর-ব্যবস্থা বলতে সামন্তযুগের ভূমি-মালিকানা ম্যানর-ব্যবস্থা ব্যবস্থাকে বোঝায়। ইউরোপে সামন্ততন্ত্র প্রচলিত হবার ফলে দেশের অধিকাংশ জমিজমার মালিক হল সামন্তরা। রাজার কাছ থেকে পাওয়া এই জমি সামন্ত-ভূস্বামীরা আবার তাদের অনুগত যোদ্ধা বা নাইটদের মধ্যে কিছু ভাগ করে দিত, কিছু রাখতো নিজের অধিকারে। এই সব জমি আর তাতে বসবাসকারী প্রজাদের তারাই ছিল প্রভু। প্রত্যেক সামন্ত-ভূস্বামীর অধিকারভুক্ত ভূমিকেই বলা হত ম্যানর। কাজেই বাংলা ভাষায় ম্যানর-ব্যবস্থাকে অনায়াসে জমিদারী-ব্যবস্থা (বা মুসলমান যুগের জায়গীরদারি) বলা যেতে পারে। সারা পশ্চিম ইউরোপ জুড়েই এই ব্যবস্থা কম-বেশি প্রচলিত হয়েছিল। সে সময় ইউরোপে কৃষিকার্য আর তার সঙ্গে যুক্ত ছোট ছোট কুটীরশিল্পই মানুষের অর্থনৈতিক জীবনযাত্রার ভিত্তি ছিল। অর্থাৎ মানুষের সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের যোগান আসতো কৃষিকার্য আর ছোট ছোট কুটীরশিল্প থেকে। ম্যানর-ব্যবস্থা জমির মালিকানার ভিত্তি ছিল বলে জমি থেকে উৎপন্ন বা জমির সঙ্গে যুক্ত কুটীরশিল্প থেকে উৎপন্ন সমস্ত দ্রব্যের বন্টনও নির্ধারিত হত এই ব্যবস্থার মারফত। সামন্ত-ভূস্বামী যে সব চাষীদের তাঁর জমি ভোগের অধিকার দিতেন, তাদের কাছ থেকে তিনি খাজনা আদায় করতেন নির্দিষ্ট হারে। প্রথম এই খাজনা কৃষিপণ্যে আদায় করা হত, পরবর্তিকালে আদায় করা হত টাকায়। সামন্ত-ভূস্বামীর নিজস্ব জমিতে এই সব চাষীদের বিনা মজুরিতে কাজ করতে হত, তাদের উৎপাদিত ফসল ম্যানর-মালিক তাঁর কাছে বিক্রী করতে বাধ্য করতেন খুব অল্প দামে। কাজেই, ম্যানর-ব্যবস্থাই সে যুগের ইউরোপের অর্থনৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রিত করতো। ম্যানর থেকে সামন্ত-ভূস্বামী যে আয় করতেন তা ছিল তাঁর অনর্জিত আয়, তার কারণ সমস্ত রকম চাষবাস বা শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদনের কাজ করতো কৃষকেরা, সামন্ত-প্রভুর খাজনা বা নিজস্ব জমির

ফসলও ওরাই সংগ্রহ করে প্রভুর খামারে বা মিল্লুকে তুলে দিত, সামন্তরা দিন কাটাতেন যুদ্ধ, শিকার, বিলাস-ব্যসন নিয়ে। এই আয়ের উপরেই তাঁদের আরাম সুখ ছিল নির্ভরশীল। তাই বলা যেতে পারে যে, সামন্ততন্ত্রের অর্থনৈতিক ভিত্তি ছিল ম্যানর-ব্যবস্থা।

সামন্ত সমাজ-ব্যবস্থার এই অর্থনৈতিক জীবন রোমান যুগের দাস-ব্যবস্থার তুলনায় একদিক দিয়ে ভাল ছিল। দাসব্যবস্থার উৎপাদন-কার্যের মূল শক্তি ছিল ক্রীতদাসরা। তাদের জোর করে ধরে এনে পশুর মত বিক্রী করে দেওয়া হত আর তাদের দ্বারা কিনতো তারাও পশুর মত তাদের খাটিয়ে নিত। তাদের নিজেদের ঘর-সংসার ছিল না, খেতে-খামারে, যন্ত্রশালায় তারা উৎপাদন করতো, সমস্তই তাদের প্রভুর সম্পত্তি হত, তার বদলে প্রভুরা তাদের কোনোরকমে বেঁচে থাকার মতো ছুঁটো খেতে দিত। এর ফলে দাসব্যবস্থায় ক্রীতদাসদের সংখ্যার তুলনায় উৎপাদন কেবলই কমে যেতে থাকে। কিন্তু সামন্ত ব্যবস্থায় এই দাসেরা নিজের জমি নিজের ঘর-সংসারের মালিক হল, সামন্ত-প্রভুরা খাজনা দিয়ে বাড়তি ফসল তার নিজের সম্পত্তি হবে জেনে সে কঠোর পরিশ্রমে উৎপাদনবৃদ্ধির চেষ্টা করতে লাগলো এবং নিজের খাওয়া-পরাতে অতিরিক্ত উৎপন্ন বিক্রী করে কিছু সঞ্চয় করার সুযোগও তার সামনে দেখা দিল। তাই, সামন্ত প্রভুর ভূমিদাস হিসেবে জমির সঙ্গে আবদ্ধ হয়েও সে ক্রীতদাসের চেয়ে বেশি স্বাধীন ও সুখী জীবনযাপন করতে লাগলো। ফলে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় ইউরোপের অর্থনৈতিক উন্নতি বৃদ্ধি পেল এবং সমাজে উৎপন্ন খনসম্পদের এক বড় অংশ ভূমিদাসরা ভোগ করার সুযোগ পেতে লাগলো। এ জন্যেই রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর ইউরোপের সমাজ-সংস্কৃতি-সভ্যতায় যে সঙ্কট দেখা দিয়েছিল তা কেটে যেতে বেশি দেরি হল না। পাঁচ-সাতশো, বছরের ভেতরেই ইউরোপের নানা অঞ্চলের সভ্যতা-সংস্কৃতিতে উন্নতি-বিকাশের লক্ষণ দেখা দিল।

সামন্তযুগে রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার ভিত্তিও ছিল ম্যানর। প্রত্যেক ম্যানরের শাসনকার্য পরিচালিত হত সেই ম্যানরের মালিক সামন্ত-প্রভুর ইচ্ছা অনুযায়ী। অবশ্য, দেশের রাজা বা সম্রাটের হুকুম সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে সামন্ত-প্রভুরা নিজের ম্যানর শাসন করতে সাধারণতঃ পারতেন না। কিন্তু রাজারাই তাঁদের ক্ষমতা দিতেন নিজ নিজ ম্যানরের প্রজাদের শাসন করবার। ফলে সামন্ত-প্রভুরাই ছিলেন প্রজাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। তাঁরাই আইন তৈরি করতেন, প্রজাদের শাসন করতেন, বিচার করতেন এবং শাস্তিও দিতেন। প্রজাকে চরম দণ্ড দেবারও তাঁরা অধিকারী ছিলেন। ম্যানরের প্রজাদের রক্ষার ভারও ছিল তাঁদের হাতে। আক্রমণকারী শত্রু, ভাকাত-মুঠেরা, যাযাবর-বর্বরদের হাত থেকে ম্যানর-প্রজাদের রক্ষার দায়িত্বও প্রভুদের বহন করতে হত। সামন্ত প্রভুরাই রাজার কাছে ম্যানরের প্রজাদের প্রতিনিধিত্ব করতেন, সকল রাজকীয় আদেশ-নির্দেশ প্রজাদের কাছে প্রচার করতেন। সামন্ত প্রভুদের পাইক-পেয়াদা-সৈন্যসামন্ত ম্যানরের শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পালন করতো।

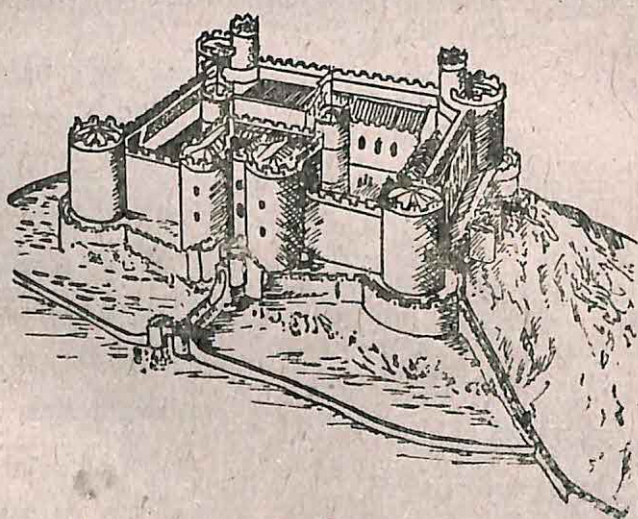
রোমান যুগে ক্রীতদাসদের মানুষ বলেই মনে করতো না তাদের প্রভুরা। তাই ক্রীতদাসদের সুখ-দুঃখের কথা তারা চিন্তা করতো না, তাদের বাঁচা-মরার দিকে সামান্যতম লক্ষ্যও ছিল না তাদের। সামন্তযুগে প্রভুশ্রেণীর মনোভাব এত নির্দয় ও হৃদয়হীন ছিল না।

কিন্তু কৃষকদের জীবনযাত্রার উন্নতির দিকে কোন অর্থনৈতিক অংশ লক্ষ্য সামন্ত-প্রভুদের ছিল না। এসব কথা ভাববার মতো মনেই তাদের ছিল না। তাই সামন্ত-প্রভুরা যেখানে বাস করতো সেই সব দুর্গ বা দুর্গের সঙ্গে সংলগ্ন বসতি-বাজার ছাড়া সারা ম্যানরের উন্নতির কথা তারা কখনও চিন্তা করতো না। ম্যানরের মধ্যে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যাবার রাস্তাঘাট ভাল ছিল না, পথে ছিল চোর-ডাকাতের উপদ্রব, লেখাপড়া শেখার বা যোগের

চিকিৎসার কোনরকম ব্যবস্থার কথা তখন ম্যানরের কৃষকেরা কল্পনা করতেই পারতো না। ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল খুবই সীমাবদ্ধ ধরনের, কেনাবেচা হত খুব কম, আর হলেও জিনিসের বদলে জিনিস দেওয়া-নেওয়া চলতো,—টাকা-পয়সার ব্যবহার ছিল নিতান্ত সীমাবদ্ধ। সামন্তপ্রভুরা কৃষকের কাছ থেকে চড়া হারে খাজনা আদায় করতো। এই খাজনা ছাড়াও তাদের কাছ থেকে গির্জার প্রণামী, যুদ্ধব্যয়, সামন্ত-প্রভুর নানা খেয়ালের ব্যয় প্রভৃতি বাবদও পীড়ন করে টাকা ও শস্ত্র আদায় করা হত। সামন্ত-প্রভুরা তাদের বহু সময় বিনা মজুরিতে খাটিয়ে নিত, ফলে তারা তাদের নিজেদের জমিতে চাষ করার সময় পেত না।

ম্যানর বা জমিদারীর ভেতর সামন্ত-ভূস্বামীরা দুর্গ তৈরি করে বাস করতো কারণ সামন্তদের নিজেদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ লেগে থাকতো আর

ম্যানর দুর্গ : সে সময় পশ্চিম ইউরোপের প্রায় কোন রাজ্যেই
জীবনযাত্রা : শান্তি-শৃঙ্খলা ভাল ছিল না। বড়-ছোট ডাকাতির
দল চারদিকে হানা দিয়ে বেড়াতো। অনেক
সামন্ত-প্রভুও নিজেদের সৈন্যদের নিয়ে ডাকাতি করতো। এ ছাড়া



মধ্যযুগের দুর্গ

নানা বাঘাবর জাতির আক্রমণেও ব্যতিব্যস্ত হত পশ্চিম ইউরোপের

নানা অঞ্চল। তাই আত্মরক্ষার জন্তই সামন্ত-ভূস্বামীদের উঁচু দেয়াল-ঘেরা দুর্ভেদ্য দুর্গ বানাতে হত। এইসব দুর্গ শত্রুর আক্রমণ রুখবার জন্যই প্রধানতঃ তৈরি হত বলে এর ভেতর সুন্দর স্থাপত্য বা নির্মাণ কৌশলের কোন ছাপ থাকতো না। দেয়াল-নকশা, মেঝের কারুকর্ষ এসবের চিহ্নও থাকতো না। চারধারে চারটে গোল গম্বুজ, তাদের ঘিরে উঁচু দেয়াল আর এই গম্বুজের ভেতর আর দেয়ালের মাথার যে অংশ ছাদের আলিসার কাজ করতো তাতে বড় বড় ফুটো থাকতো তাঁর ছোঁড়ার জন্ত। শত্রুসৈন্য দুর্গ ঘেরাও করলে তাদের ওপর ছাদ থেকে পাথর, গরম তেল, জ্বলন্ত কাঠ প্রভৃতি ফেলবার ব্যবস্থা থাকতো। দুর্গের মধ্যে সামন্ত-ভূস্বামীর প্রাসাদ ছাড়াও সৈন্যদের ছাউনি, আস্তাবল, অস্ত্রাগার এসব থাকতো। এ ছাড়া দুর্গের ভেতর বাজার, গির্জা, দোকানপাট, কামারশালা, ছুতোরের দোকান এসবও থাকতো। শত্রুসৈন্য দুর্গ ঘেরাও করলে টিকে থাকবার জন্তে জলের ব্যবস্থা থাকতো, থাকতো খাদ্যশস্য জমিয়ে রাখবার ব্যবস্থা।

দুর্গগুলো সাধারণতঃ ছোটখাট পাহাড়ের ওপর তৈরি করা হত আর তার চারিদিকে থাকতো, চওড়া গভীর পরিখা। অনেক সময় সমতল জায়গায় দুই বা তিন দিকে নদী বা সমুদ্রবেষ্টিত জায়গায় এ রকম দুর্গ তৈরি হত। পরিখার ওপর থাকতো একটা টানা সেতু ঠিক দুর্গের দরজার মাপে। চাকা ও কপিকলের সাহায্যে এই সেতুটা ওঠানো-নামানো হত। শান্তির সময়ও সন্ধ্যা হবার আগেই এই সেতু ভুলে দুর্গের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হত, আবার নামিয়ে দেওয়া হত সকালবেলা। দুর্গের উঁচু গম্বুজে দিনরাত সৈন্যরা পাহারা দিত।

সামন্ত-ভূস্বামীদের থাকবার বাড়ীটাই ছিল দুর্গের প্রধান অংশ। তাই এটাও তৈরি হত খুব পোক্ত করে। উঁচু দেয়ালে ঘেরা এই দুর্গ-প্রাসাদের ভেতরেই থাকতো সভাকক্ষ, ভোজন কক্ষ আর ছোট ছোট শোবার ঘর। সভাকক্ষের তিন দিক দিয়ে সরু সরু গলি এই সব শোবার ঘরে, দুর্গের গম্বুজে, ছাদে পৌঁছানো যেত। প্রাসাদের দরজায়, গলিতে, সভাকক্ষের দরজায় সৈন্যরা পাহারা দিত দিনরাত।

সামন্ত-ভূস্বামীরা ছিল খুব যুদ্ধপ্রিয়। বছরের বেশি সময় তারা দুর্গের বাইরে দেশে-বিদেশে লড়াই করে কাটাতে। যখন লড়াই করার সুবিধে থাকতো না তখন প্রায়ই দলবল নিয়ে পাখি শিকার বা হরিণ শিকার করতে বেরুতো; হিংস্র জানোয়ার শিকার করবার উৎসাহ ছিল খুব বেশি। বাকি দিনগুলো কাটাতে প্রজা-ঠেঙিয়ে, বিচার করে, সৈন্যদের তালিম দিয়ে। মাঝে মাঝে নকল লড়াই বা অস্ত্র-পরীক্ষার আসরও বসতো দুর্গের বাইরে খোলা মাঠে। রাতে চলতো পান-ভোজন, চারণ-কবিদের গান, ভাঁড়ের ভাঁড়ামি। এমনি করেই সে যুগের সামন্ত প্রভুরা দিন কাটাতে।

সামন্তযুগে ইউরোপে সমাজে তিনটি শ্রেণী গড়ে ওঠে, ধর্মযাজক শ্রেণী, সামন্ত শ্রেণী আর জনসাধারণ। ধর্মযাজকেরা প্রধানতঃ মঠবাসী ছিলেন। ম্যানরের গির্জার যাজকেরা কাটাতেন দুর্গে। এঁরা সামন্ত-প্রভুদের পরামর্শ দিতেন। লেখাপড়ার কাজ দরকার হলে করে দিতেন, যুদ্ধে যাবার সময় গির্জায় যীশু-মেরীর পূজা দিয়ে সামন্তপ্রভুর জয়কামনা করতেন। দুর্গের অধিবাসীদের ধর্মোপদেশ দেওয়াও তাঁদের কাজ ছিল। এঁরা মর্যাদায় সামন্ত-প্রভুদের সমকক্ষ ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এঁরা রাজার আনুগত্যও স্বীকার করতেন না। যাজক সম্প্রদায়কে পরিচালনা করার বা নির্দেশ দেবার একমাত্র অধিকারী ছিলেন রোমের পোপ। বিভিন্ন দেশে এঁরা কার্যতঃ

সামন্ত সমাজের
 তিনশ্রেণী : যাজক এক পাল্টা রাজত্ব চালাতেন। এঁদের মঠগুলোর হাতে ছিল বড় বড় জমিদারী, এছাড়াও সমস্ত ম্যানরের প্রজাদের কাছ থেকেই এঁরা উৎপন্ন শস্যের এক-দশমাংশ গির্জার প্রণামী হিসাবে পেতেন। দেশের সাধারণ মানুষের ওপর ধর্মের প্রভাব তখন খুব প্রবল ছিল বলে সামন্তরা, এমন কি রাজারাও যাজক সম্প্রদায়ের কাজকর্মে হস্তক্ষেপ করতে সাহস পেতো না।

সামন্ত শ্রেণী রাজার প্রতি বা নিম্নতর সামন্ত-ভূস্বামী তার প্রভু উচ্চতর সামন্ত-ভূস্বামীর প্রতি প্রচলিত আইন অনুসারে আনুগত্য প্রকাশে বাধ্য ছিল। কিন্তু কার্যতঃ বড় বড় সামন্ত-ভূস্বামীরা রাজা

বা সম্রাটকে তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী চলতে অনেক সময় বাধ্য করতে পারতো। পশ্চিম ইউরোপের ফ্রান্স, জার্মানী, ইতালী, স্পেন প্রভৃতি অঞ্চলে সামন্তরা এতই শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল যে, ক্যারোলিঙ্গীয় বা জার্মান সম্রাটেরা কার্যতঃ তাদের হাতের পুতুল হয়ে পড়েছিলেন। দেশের জমিজমা আর সৈন্যসামন্তের অধিকাংশ এদের অধিকারে ছিল।

ইউরোপের মানব-সমাজের বাকী জনসাধারণ ছিল সবচেয়ে দুর্বল আর দুর্দশাগ্রস্ত। শিল্প বা ব্যবসা-বাণিজ্যের তেমন উন্নতি না হওয়ায় ব্যবসায়ী সম্প্রদায় প্রথমে অত্যন্ত দুর্বল ও বিচ্ছিন্ন ছিল। ক্রমে দেশের আর্থিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তারা কিছু পরিমাণে শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং ইতালী, ফ্ল্যান্ডার্স (বর্তমান সুইডেন-বেলজিয়াম) অঞ্চলে শক্তিশালী নগর-সভ্যতা গড়ে তোলে। কিন্তু ব্যবসায়ীরা সামন্তযুগে কখনও সামন্ত-অভিজাতদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করতে পারে নি।

সমাজের আর সব মানুষেরা ছিল কৃষিজীবী। চাষবাসের সঙ্গে কিছু কিছু কুটারশিল্পেও এরা শ্রম নিয়োগ করতো, কিন্তু তখনকার কুটারশিল্পীরা কৃষিকার্যের সহযোগী হিসাবেই কুটারশিল্প পরিচালনা করতো। শিল্প তখনও কৃষিকর্ম থেকে আলাদা হয় নি।

কৃষকরা আবার ছিল দুই শ্রেণীর,—চাষী ও ভূমিদাস। যে সব মানুষ সামন্তযুগ শুরু হবার আগে থেকেই স্বাধীনভাবে চাষবাস করতো, নিজেরাই নিজেদের জমির মালিক ছিল, সামন্ততন্ত্র আরম্ভ হবার পর সামন্ত-প্রভুরা এদের জমির মালিকানা কেড়ে নেয় জোর করে। কখনও বা চোর-ডাকাত, বাঘাবর বর্বরদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যও এরা সামন্ত-ভূস্বামীদের আনুগত্য স্বীকার করে। সামন্ত-প্রভুরা এদের আবার সেসব জমি ফিরিয়ে দেয় নির্দিষ্ট খাজনা দেবার আর বিনা মজুরিতে সামন্ত প্রভুদের জমি চষাবার বা অথ কাজ করে দেবার শর্তে। ম্যানরের

অন্তর্গত গ্রামে গ্রামে এই সব চাষীরা গ্রাম-পঞ্চায়েতে সংঘবদ্ধ থাকলেও সামন্ত-প্রভুদের বিরুদ্ধে নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারে নি। সামন্ত-প্রভুরা পঞ্চায়েতগুলোকে বাধ্য করেছে একত্র হয়ে তাদের জমিজমা বিনা মজুরিতে চাষ করতে। অবশ্য এর ফলে পঞ্চায়েতগুলো ভেঙে যায় নি, তারা নিজেদের সংঘবদ্ধ রেখে সামন্ত-প্রভুদের শোষণ ও অত্যাচার থেকে নিজেদের রক্ষা করবার সাধ্যমত চেষ্টা করতো, সংঘবদ্ধভাবে চাষবাস করে কৃষি-উৎপাদন বাড়াবার চেষ্টা করতো। এদের মধ্য থেকেই সামন্ত-প্রভুরা সৈন্য সংগ্রহ করতো, মঠগুলোতেও চাষী গৃহস্থের মধ্য থেকেই সংগৃহীত হত সাধারণ যাজক-কর্মী। মঠের বিদ্যালয়গুলোতে লেখাপড়া শিখে এদের মধ্য থেকেই বেরতো সামন্ত-প্রভুদের নীচুতলার কর্মচারীরা। অর্থনৈতিক দিক থেকে সামন্ত-ভূস্বামী আর চাষীরা ছিল দুই বিপরীত মেরুতে,—সামন্তরা শোষণ ধনী আর চাষীরা শোষিত দরিদ্র।

সামন্তযুগে সাফ বা ভূমিদাস-ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়। এই ভূমিদাসরা সামন্ত-প্রভুর জমিতে, গৃহস্থলীতে সব রকম কাজ সাফ বা ভূমিদাস বিনা মজুরিতে করতে বাধ্য থাকতো। খাজনার বদলে তাদের দিতে হত সব সময়ের শ্রম বিনা মজুরিতে। নিজেদের জমিচাষ বা জীবিকার জন্য অন্য কোন রকম কাজের সময় তারা শুধু তখনই পেত যখন সামন্ত-জমিদারের কাজের জন্য তাদের ডাকা হত না। এ রকম শ্রয়োগ অবশ্য তাদের খুব কম মিলতো। বংশানুক্রমে তাদের একই জমিতে আবদ্ধ থেকে জমির মালিকের সেবা করতে হত। জমি ছেড়ে চলে গেলে সামন্ত-জমিদার তাদের ধরে এনে যেমন খুশি সাজা দিতে পারতো। জমিদারদের সামন্ত-ভূস্বামীরা কিছুই দিত না একটুকরো জমি ছাড়া। সামন্ত-ভূস্বামীর সেবা করে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভূমিদার তার জমিতে কৃষিকার্য করার সময় বড় একটা পেত না। তার ছেলেমেয়ে, স্ত্রী সকলকেই সামন্ত-জমিদারের বেগার দিতে হত। ফলে ভূমিদাসদের দুই বেলা খাবার জোটানো সম্ভব হত না। তাদের

[ম্যানর ছেড়ে] আর কোথাও গিয়ে থাকতে বা কাজ করতেও দেওয়া হত না।

এর ফলে ভূমিদাসদের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়ে ওঠে। এই অবস্থা থেকে রক্ষা পাবার তিনটি মাত্র পথ তাদের কাছে খোলা ছিল। প্রথম উপায় ম্যানর থেকে পালিয়ে শহরে আশ্রয় নেওয়া আর সেখানকার ব্যবসায়ীদের চাকরি করা অথবা শহরে প্রতিকারোপথ সে সময় যে সব ছোটখাট শিল্প গড়ে উঠছিল তাতে শ্রমিক হিসেবে কাজ করা। এইজন্মেই মধ্যযুগের শহরগুলোতে সে যুগে ভিক্ষুক আর বেকারের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছিল। দ্বিতীয় উপায় ছিল মঠের আশ্রয় নিয়ে যাজক-সন্ন্যাসীর সংখ্যাবৃদ্ধি করা। আর এক উপায় ছিল ঘরবাড়ী জমি ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে চোর-ডাকাতের দলে ভিড়ে যাওয়া।

এই সব অত্যাচার আর শোষণের মাত্রা ক্রমাগত বাড়তে থাকার ফলে পশ্চিম ইউরোপের কৃষিজীবী মানুষ শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহী হয়ে উঠলো, ঠিক যেমন রোমের ক্রীতদাসরা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল স্পার্টাকাসের নেতৃত্বে। চতুর্দশ শতাব্দীতে ইতালী, ফ্রান্স ও ইংলণ্ড

এই তিন দেশেই তিনটি ব্যাপক কৃষক বিদ্রোহ ঘটে। ১৩৮১ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াট টাইলারের নেতৃত্বে ইংলণ্ডে যে কৃষক বিদ্রোহ হয় তার ব্যাপকতা সবচেয়ে বেশি। বিদ্রোহী কৃষক বাহিনী লণ্ডন শহর পর্যন্ত অধিকার করেছিল। প্রায় একই সময়ে ইতালীতে দোলসিনো আর ফ্রান্সে জ্যাকুয়েরে (Jacquiere) কৃষক-বিদ্রোহ অনুষ্ঠিত হয়।

অনুশীলনা

- (১) সামন্ততন্ত্র কাকে বলে? সামন্ততন্ত্রের উদ্ভবের কারণ কি? দাস-ব্যবস্থার সঙ্গে এর তফাত কোথায়?
- (২) সামন্তব্যবস্থার প্রকৃতি সংক্ষেপে বর্ণনা কর। পশ্চিম ইউরোপের শাসনব্যবস্থায় এর কল কি হয়েছিল?

(৩) বর্বরদের আক্রমণ থেকে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা পশ্চিম ইউরোপকে কিভাবে রক্ষা করেছিল তা সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

(৪) 'শিভালরি' কাকে বলে? কারা শিভালরির জন্ম দিয়েছিল? শিভালরির আদর্শকে প্রচার ও রক্ষার কাজ কারা কিভাবে করেছিল?

(৫) দুর্গ কি? দুর্গে কারা থাকতো এবং কেন? একটি দুর্গের গঠন ও দুর্গবাসীদের জীবনযাত্রার বর্ণনা দাও।

(৬) মধ্যযুগীয় ইউরোপে সামন্ত-ব্যবস্থার অবদান সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

(৭) 'ম্যানর' কাকে বলে? ম্যানর-ব্যবস্থাকে সামন্ততন্ত্রের অর্থনৈতিক ভিত্তি বলা হয় কেন? ম্যানর-ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

(৮) সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার ভিত্তি কি ছিল? কেন একে সামন্ত-তান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার ভিত্তি বলা হয়?

(৯) ভূমিদান কাদের বলে? ভূমিদান ব্যবস্থার উৎপত্তি কি করে হয়? কৃষকদের সঙ্গে ভূমিদানদের পার্থক্য কি?

(১০) 'সামন্ত-ভূস্বামী আর কৃষক দুই বিপরীত মেরুতে অবস্থান করতো।—এই উক্তিটির তাৎপর্য বুঝিয়ে দাও। এর ফল কি হয়েছিল?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :-

(ক) টীকা লিখ :- নাইট, শিভালরি, ওয়াট টাইলার, লর্ড।

(খ) ট্রুবের কাণের বলা হত? সামন্ত-সমাজে তাদের গুরুত্ব কি ছিল?

(গ) সামন্ততন্ত্রের উদ্ভবের ফলে রাজার শক্তি দুর্বল হয়েছিল কেন?

(ঘ) কে, কখন, কেন সামন্তব্যবস্থার সূত্রপাত করেন?

(ঙ) 'মালিকবিহীন জমি নাই, জমিহীন মালিক নাই।'—এই উক্তি কোন্ ব্যবস্থার ভিত্তি এবং কেন?

অষ্টম অধ্যায়

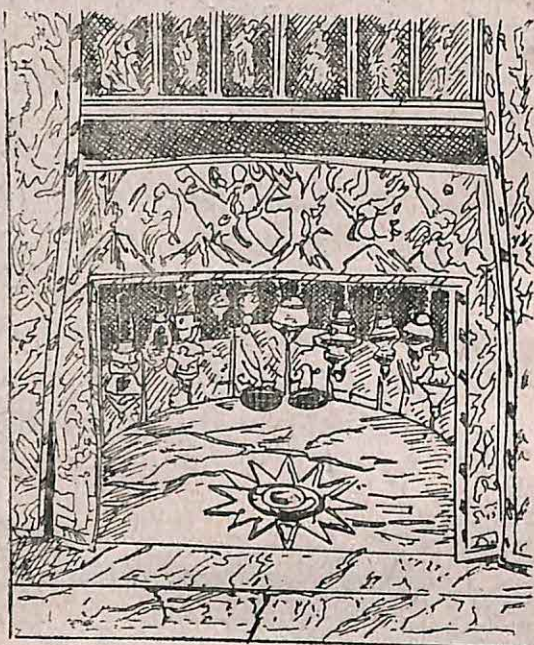
ক্রুসেড

[**সংক্ষিপ্তসার :** প্রায় দুশো বছর ধরে (১০৯৬—১২৯১) ইউরোপের খ্রীষ্টানরা মুসলমানদের অধিকার থেকে যীশুখৃষ্টের জন্মভূমি প্যালেস্টাইন, বিশেষ করে তার প্রধান শহর জেরুজালেম উদ্ধার করবার জন্য যে অভিযান চালিয়েছিল, মধ্যযুগীয় ইউরোপের ইতিহাসে তাকেই ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ বলা হয়। ১০৯৫ খ্রীষ্টাব্দে বাইজান্টাইন সম্রাট এ্যালেক্সিন কমনেনাসের অনুরোধে পোপ দ্বিতীয় উরবান ইউরোপের খ্রীষ্টানদের এই ধর্মযুদ্ধে অংশ নেবার ডাক দেন। তারপর থেকে সবুজ আটটি ক্রুসেড যুদ্ধ অহুষ্ঠিত হয়। প্রথম তিনটি ক্রুসেড ইউরোপের নানা রাজ্যের সম্মিলিত বাহিনী কিছু সাফল্যলাভ করলেও শেষ পর্যন্ত জেরুজালেম মুসলমানদের অধিকারেই থেকে যায়। পশ্চিম ইউরোপের ক্রুসেডাররা শেষ পর্যন্ত কনস্টান্টিনোপল দখল করে এবং প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল নিজেদের অধিকারে রাখে। পবিত্র জেরুজালেম অধিকার করতে ইউরোপীয় যোদ্ধারা ব্যর্থ হলেও ক্রুসেড ইউরোপের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনধারায় এক ব্যাপক পরিবর্তনের সূচনা করে।]

খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত যে ঘটনা ইউরোপের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তা হল ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ। ইউরোপের ক্রুসেড : কারণ

খ্রীষ্টান জগতের কাছে প্যালেস্টাইন এক পবিত্র জন্মভূমি, কারণ এখানেই যীশু জন্মেছিলেন আর এখানেই তিনি ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন। এই প্যালেস্টাইন ছিল রোম সাম্রাজ্যের অধিকারে। বাইজান্টাইন সম্রাটদের উৎসাহে এবং কনস্টান্টিনোপলের রাজক সন্ত্রাসের আওতে জেরুজালেম ও যাসুর জন্মস্থান বেথলেহেম-এ খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে সুন্দর সুন্দর গির্জা নির্মিত হয়। পঞ্চম শতাব্দীতে রোমের পতন ঘটলেও প্যালেস্টাইন বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের অধিকারে থাকে। ইউরোপ থেকে শত শত তীর্থযাত্রী এই পবিত্র ভূমিতে আসতো। ইসলামের অভ্যুদয়ের পর অষ্টম শতাব্দীতে প্যালেস্টাইন মুসলমান

অধিকারভুক্ত হয়। নবম শতাব্দীতে বাইজান্টাইন সম্রাটরা প্যালেস্টাইন আবার দখল করেন, কিন্তু একাদশ শতাব্দীতে সেনজুক তুর্কী মুসলমানরা আবার প্যালেস্টাইন কেড়ে নেয়।



খ্রীষ্টীয় জন্মস্থান বৈথেলেহেম-এর গির্জার ভেতরের দৃশ্য:

এর ফলে ইউরোপের খ্রীষ্টানদের পবিত্র ভূমিতে তীর্থযাত্রা প্রায় বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়। বাইজান্টাইন সম্রাট এ্যালেক্সিওস কমেলাস নিজের শক্তিতে প্যালেস্টাইন অধিকার করতে পারবেন না বুঝতে পেরে পোপ দ্বিতীয় উরবানের কাছে আবেদন জানান বিধর্মী মুসলমানদের হাত থেকে প্যালেস্টাইন উদ্ধারে তাঁকে সাহায্য করবার জন্য। এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে পোপ দ্বিতীয় উরবান ১০৯৫ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিম ইউরোপের খ্রীষ্টান জনসাধারণ ও রাজাদের আহ্বান জানান প্যালেস্টাইন উদ্ধারে অংশ গ্রহণ করতে। ফলে ১০৯৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ সংগঠিত হয়।

এই যুদ্ধে ইউরোপের যে সব রাজারা, অভিজাত সামন্তরা আর
ক্রসেড নামের
অর্থ
নাইটরা যোগ দিয়েছিলেন তাঁরা সবাই ক্রুশচিহ্নিত
পতাকা নিয়ে যুদ্ধযাত্রা করেন। এইজন্যেই এই
অভিযানের নামকরণ হয় ক্রসেড, অর্থাৎ পবিত্র
ক্রুশ উদ্ধারের অভিযান।

পশ্চিম এশিয়ার তুর্কী অধিকৃত এই অঞ্চলের বিরুদ্ধে পরিচালিত
এই অভিযানের পেছনে বিভিন্ন উদ্দেশ্য সক্রিয় ছিল। বাইজান্টাইন
সম্রাট এ্যালেক্সিস কমেনাসের উদ্দেশ্য ছিল ইউরোপীয় সামন্ত-শক্তির
সাহায্যে তাঁর প্যালেস্টাইন রাজ্য পুনরুদ্ধার করা।

উদ্দেশ্য

পোপ দ্বিতীয় উরবান ভেবেছিলেন যে পশ্চিম ইউ-
রোপের সামরিক শক্তি প্যালেস্টাইন উদ্ধার করতে পারলে পবিত্র
ভূমির ওপর রোমান ক্যাথলিক গির্জার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হবে এবং
বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যে, অর্থাৎ বাইজান্টিয়াম, রাশিয়া, বুলগেরিয়া,
এশিয়া মাইনর প্রভৃতি অঞ্চলে গ্রীক ধর্মযাজকদের আধিপত্য
ক্ষুণ্ণ হবে। আবার, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, জার্মানী প্রভৃতি অঞ্চলের রাজা
ও সামন্তভূস্বামীরা এই যুদ্ধের ভেতর দিয়ে পশ্চিম এশিয়ার সমৃদ্ধ
অঞ্চলগুলো লুট করে নিজেদের ধনবৃদ্ধির স্বপ্ন দেখছিলেন। সিসিলির
নর্মান প্রভুরা চাইছিল বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যকে নিজেদের অধিকারভুক্ত
করতে। সে সময় পশ্চিম ইউরোপ জুড়ে সম্পত্তিহীন যে নাইটেরা
যুদ্ধ আর লুটপাটের ভেতর দিয়ে ধনসম্পদ অর্জনের চেষ্টা করছিল,
তাদের ক্রসেড নূতন রাজ্যজয়ের আশায় মাতিয়ে তুলেছিল।
১০৯৫-৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপ জুড়ে অকাল দেখা দেয়, ফলে সাধারণ
কৃষক দুর্ভিক্ষপীড়িত ও দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। এর ওপর সামন্ত-
প্রভুদের শোষণ তাদের আরও দুঃখকষ্টের মধ্যে ঠেলে দিয়েছিল। তাই
তাঁরা মরিয়া হয়ে ক্রসেড যোগ দিয়েছিল নূতন দেশে জমিজমা
দখল করে প্রাণ বাঁচাবার আশায়। এ ছাড়া, ভেনিস, মিলান,
জেনোয়া প্রভৃতি ইতালীর বাণিজ্য-কেন্দ্রের ব্যবসায়িশ্রেণীও
ক্রসেড-এ সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিল এই আশায় যে এইসব

অভিযানের ফলে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের আধিপত্য নষ্ট হলে তার প্রাচ্যদেশের সঙ্গে বাগিজ্যের পুরো লাভ ভোগ করতে পারবে।

কাজেই বলা যেতে পারে যে ইউরোপের বিভিন্ন শ্রেণী ধর্মের নামে, পবিত্র ভূমি উদ্ধারের নামে ক্রুসেডে যোগ দিলেও নিজেদের বৈবয়িক স্বার্থসাধনেই বেশি মনোযোগী ছিল। আর এইজন্যই ইউরোপের সমরশক্তি ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্যালেস্টাইন উদ্ধারে সফল হতে পারে নি। রাজনৈতিক দিক থেকে ক্রুসেড প্রকৃতপক্ষে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যকেই দুর্বল করে ফেলেছিল, তাই পঞ্চদশ শতাব্দীতে তুর্কী আক্রমণের ফলে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের পতন হয় আর পূর্ব ইউরোপের গ্রীস, রুম্যানিয়া, বুলগেরিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে অটোমান তুর্কীদের দীর্ঘস্থায়ী প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

আটটি ক্রুসেড-এর মধ্যে একমাত্র প্রথম ক্রুসেড ঘোষিত লক্ষ্যসাধনে সবচেয়ে বেশি সফল হয়েছিল। ১০৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপের কৃষকশ্রেণীর মানুষেরা দল বেঁধে প্যালেস্টাইন উদ্ধারে যাত্রা করে।

প্রথম ক্রুসেড প্রায় পঞ্চাশ হাজার নরনারী-শিশু এই অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিল। একে জগৎগণের ক্রুসেড বলা হয়ে থাকে। উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্র, সমরদক্ষতা এবং খাদ্য, যানবাহন প্রভৃতির সম্পূর্ণ অভাব থাকায় এই গণবাহিনী পথের কষ্টে এবং তুর্কীদের আক্রমণে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়। এরপর, ১০৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী, জার্মান, নর্মান ও ইতালীয় নাইটদের এক সম্মিলিত বাহিনী প্যালেস্টাইন অভিযান করে এবং ১০৯৯ খ্রীষ্টাব্দে জেরুজালেম অধিকার করে। কিন্তু এই বিজয় অভিযানের ফলে অধিকৃত অঞ্চলগুলি বাইজান্টাইন সম্রাটকে ফিরিয়ে দেওয়া হল না, পোপের হাতেও অর্পণ করা হয়নি। এখানে গড়ে উঠলো চারটি স্বাধীন রাষ্ট্র, জেরুজালেম, এ্যান্টিয়োক, এডেসা ও ত্রিপলী। এই সমুদ্রপারের রাজ্যগুলি গড়ে উঠলো পশ্চিম ইউরোপের সামন্ততান্ত্রিক রাজ্যগুলোর অনুকরণে।

১১৪৪ খ্রীষ্টাব্দে তুর্ক রা এডেসা অধিকার করলে ক্রেরারভো মঠের প্রধান ধর্মযাজক বার্নার্ড দ্বিতীয় ক্রুসেডের ডাক দেন। পবিত্র রোমান

সম্রাট তৃতীয় কনরাদ এবং ফ্রান্সের রাজা সপ্তম লুই এই অভিযান পরিচালনা করলেও এই অভিযান সম্পূর্ণ ব্যর্থ দ্বিতীয়-তৃতীয় ক্রুসেড হয়। অটোমান তুর্কী রাজা সালাদিন জেরুজালেম পুনরধিকার করলে তৃতীয় ক্রুসেড শুরু হয়।

ফ্রান্সের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ, ইংলণ্ডের রাজা প্রথম রিচার্ড এবং পবিত্র রোমান সম্রাট প্রথম ফ্রেডারিক এই অভিযান আরম্ভ করেন। প্রথম ফ্রেডারিক পথে অসুস্থ হয়ে মারা যান, দ্বিতীয় ফিলিপ ও প্রথম রিচার্ডের মধ্যে ভীষণ বাগড়ার ফলে দ্বিতীয় ফিলিপ অভিযান থেকে সরে যান। প্রথম রিচার্ড একা ইংরেজ সেনার সাহায্যে প্রবল লড়াই করে একার দুর্গ অধিকার করেন, কিন্তু জেরুজালেম দখল করতে পারেন না, শুধু সালাদিনের সঙ্গে এক সন্ধি করে জেরুজালেমে খ্রীষ্টান তীর্থযাত্রীদের প্রবেশের অধিকার নিশ্চিত করেন। ১২০৪ খ্রীষ্টাব্দে

চতুর্থ ক্রুসেড শুরু হয় প্রধানতঃ ভেনিসের বালিওলের সাহায্য-সহযোগিতায়। এই ক্রুসেড প্যালেস্টাইন অভিযানের পরিবর্তে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল আক্রমণ করে অধিকার করে, নগরীর ধনরত্ন লুণ্ঠ করে, মূল্যবান পুথি ও চিত্র ধ্বংস করে এবং কনস্টান্টিনোপলে পশ্চিম ইউরোপীয়দের আধিপত্য চলে পঞ্চাশ বছর ধরে। এই ক্রুসেডের ফলেই বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত পঞ্চদশ শতাব্দীতে এই সাম্রাজ্যের পতন হয়।

ইউরোপের সমাজ-জীবনে ক্রুসেডের প্রভাব কিন্তু পরোক্ষভাবে খুব উপকার করেছিল। রোমান যুগের দীর্ঘকাল পর (প্রায় ছয়শো বছর) ইউরোপের মানুষ এশিয়ার উন্নততর সভ্যতা, জীবনযাত্রা, সুখসমৃদ্ধির সঙ্গে পরিচিত হয়। এর ফলে সামন্ত-ভূস্বামীদের রুচি বদলায়, তুর্কী-সংস্কৃতি জীবনে আরবী সামন্তপ্রভুদের মতো বিলাসী জীবনযাপনের জন্য তারা আগ্রহান্বিত হয়ে ওঠে। লড়াইয়ের অস্ত্র-শস্ত্র, দুর্গনির্মাণ ব্যবস্থা প্রভৃতি সব ব্যাপারেই এশীয় তুর্কীদের অনুসরণের

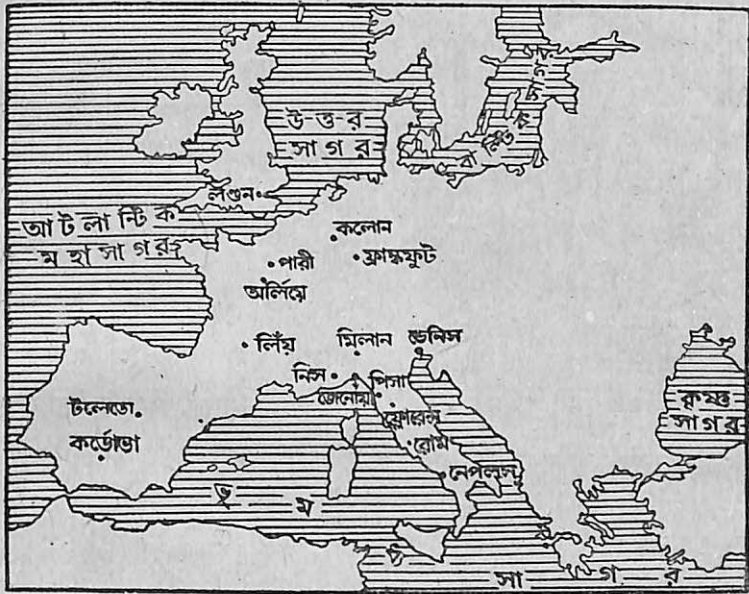
চেষ্টা চলতে থাকে। এর ফলে ইউরোপের কুটীর শিল্পের দ্রুত উন্নতি আরম্ভ হয়। ক্রসেডে অংশগ্রহণকারীরা সুন্দর কারিগরির নিদর্শন যে সব জিনিসপত্র স্বদেশে নিয়ে এসেছিল, সেগুলোর অনুকরণের চেষ্টায় তারা ক্রমে তাদের কারিগরি দক্ষতা বাড়তে সক্ষম হয়। সামন্তপ্রভুরা আরাম আর স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য তাদের বাড়ীঘরের আসবাবপত্র, সাজসজ্জা, পোশাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতি যত বেশি ব্যবহার করতে থাকে ততই শিল্পজাত দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদাও বাড়তে থাকে। এর ফলে কুটীর শিল্পের বিকাশ এত দ্রুতগতিতে ঘটতে থাকে যে, কারিগরদের পক্ষে চাষবাস করে এসব জিনিসপত্র তৈরি করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। অতএব, শিল্পজাত পণ্যের চাহিদা অনেক বেশী বেড়ে যাওয়ায় কারিগরদের পক্ষে চাষবাস ছেড়ে শুধুমাত্র শিল্পকার্যে সম্পূর্ণ সময় নিয়োগ করা লাভজনক হয়ে ওঠে। তাই কৃষিকার্য আর শিল্পকার্য আলাদা হয়ে যায়,—ইউরোপে শিল্পকার্যে নিযুক্ত কিন্তু কৃষিকার্যের সঙ্গে সম্পর্কহীন উৎপাদকশ্রেণীর উদ্ভব হয়।

কৃষি ও শিল্পের
স্বতন্ত্রীকরণ

রাজ্যের রাজধানীকে কেন্দ্র করে নগর-সভ্যতা গড়ে ওঠার যে রীতি গ্রীক-রোমান যুগে শুরু হয়েছিল, রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর ইউরোপে তার অবসান ঘটেছিল। একমাত্র প্রাচ্য রোমান সাম্রাজ্য বা বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টান্টিনোপলে গ্রীক-রোমান সভ্যতার ধারাটি টিকে ছিল। দশম-একাদশ শতাব্দীতে ভূমধ্যসাগরে জাহাজ চলাচল নিরাপদ হলে ইতালীতে জেনোয়া, ভেনিস, নেপলস্ প্রভৃতি বাণিজ্যকেন্দ্রগুলি সমৃদ্ধ নগর হিসাবে বিকাশলাভ করতে থাকে। ক্রসেড-এর প্রভাবে শিল্প বাড়তে থাকলে এবং কৃষিকার্য থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে শিল্পকেন্দ্রগুলি গড়ে উঠতে থাকলে সেগুলিকে ঘিরে নূতন নূতন শহরের জন্ম হতে আরম্ভ করে পশ্চিম ইউরোপ জুড়ে। ইতালীর মিলান, পিসা, পালার্মো, ফ্লোরেন্স, ক্ল্যাগুর্স-এর ঘেন্ট, ব্রাজেস, জার্মানীর কলোন, হামবুর্গ, ফ্রান্সের লিয়ঁ,

নগর বাণিজ্য-
কেন্দ্রের বিকাশ

বাসুল, ইংলণ্ডের লণ্ডন প্রভৃতি শিল্পকেন্দ্রগুলো বর্ধিষ্ণু শহরে পরিণত হয়। এইসব শহরে বণিকেরা ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে এবং নিজেদের শহরগুলোকে রক্ষা এবং বাণিজ্যের নিরাপত্তার জন্য সুসজ্জিত সৈন্যদলও গড়ে তোলে। ভেনিস, জেনোয়া প্রভৃতি সামুদ্রিক বাণিজ্য-কেন্দ্রগুলো



ইউরোপীয় শিল্প-শহরের মানচিত্র

নিজেদের নৌবহরও গড়ে তুলেছিল। এইসব শহরগুলি বিভিন্ন রাজার কাছ থেকে অর্থের বিনিময়ে অথবা প্রবল আন্দোলনের মাধ্যমে নগর-গুলোর জন্য বিশেষ অধিকার আদায় করে নেয়।

এইসব অধিকারের ভেতর প্রধান অধিকার ছিল যে, শহরের ব্যবসায়ী আর কারিগরেরা শহরবাসী লোকদের কাছ থেকে কর আদায় করতে পারবে, নিজেদের শহর পরিচালনার নিয়ম-কানুন বানাতে পারবে, সামন্ত-ভূস্বামীরা তাদের ওপর 'বোজ্জু'ইস' শব্দের

উৎপত্তি

কোনোভাবে প্রভুত্ব করতে পারবে না ইত্যাদি। তারপর তারা কর-আদায়, শহরের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা, আবর্জনা-পরিষ্কার প্রভৃতির জন্য একটি করে নির্বাচিত নগর পরিষদ গঠন করে। কর-আদায়ের অধিকারের লাতিন প্রতিশব্দ

থেকে এইসব পরিষদগুলোর নাম হয়, 'বোরো', আর তাদের সদস্যদের নাম 'বোজুইস'। আধুনিক যুগে এই শব্দটা বিত্তবান ধনিকশ্রেণীর লোককে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।



শিক্ষানবিশদের পরীক্ষা

শহরের শিল্পকেন্দ্রগুলোকে ভিত্তি করে গিল্ড প্রথাও গড়ে ওঠে একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দী থেকে। এই শিল্পকেন্দ্রগুলো ছিল কুটীরশিল্প। কারিগররা নিজেদের ও পরিবারের অর্থ মূলধনে পণ্য উৎপাদন করতো। ক্রমে তাদের পণ্যের চাহিদা

বাড়তে আরম্ভ করলে, বাজার প্রসারিত হলে উৎপাদন বাড়ানোর জন্য বেশি কর্মীর প্রয়োজন হতে আরম্ভ করে। তখন শিক্ষানবিশ নিয়োগ আরম্ভ হয়। এইসব শিক্ষানবিশের মজুরি

আর উৎপন্ন দ্রব্যের বিক্রয়-মূল্য স্থির রাখবার জন্য একই প্রকার দ্রব্য-উৎপাদক কারিগরদের নিজেদের মধ্যে সংঘ গঠন করতে আরম্ভ করে। এই ব্যবস্থাকেই গিল্ড প্রথা বলা হয়। এইসব সংঘের মাধ্যমে উৎপন্ন দ্রব্যের গুণগত মান অক্ষুণ্ণ রাখা, দাম স্থিতিশীল রাখা, প্রতিযোগিতা বর্জন এবং শিক্ষানবিশদের মজুরি স্থির রাখার ব্যবস্থা করা হত। পরবর্তিকালে ইউরোপের সমস্ত শিল্প-শহরে গিল্ড



রঞ্জক গিল্ড-এর কার্য

রাখা, প্রতিযোগিতা বর্জন এবং শিক্ষানবিশদের মজুরি স্থির রাখার ব্যবস্থা করা হত। পরবর্তিকালে ইউরোপের সমস্ত শিল্প-শহরে গিল্ড

প্রথা শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ক্রমে শহরগুলি বড় বড় শিল্পক্ষেত্রে পরিণত হয়, রোজপারের সুযোগ বেড়ে যাওয়ায় সামন্তভূস্বামীদের অধীন ভূমিদাসেরা শহরে পালিয়ে এসে শ্রমকার্যে নিযুক্ত হতে থাকে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শহরের স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য, শৃঙ্খলারক্ষার জন্য পৌর-প্রশাসন ব্যবস্থাও গড়ে উঠতে থাকে।

এইসব শহরে সারাদিন লোকের আনাগোনা চলতো। চাষীরা তাদের উৎপন্ন ফসল, শাকসব্জি, ছাগল-ভেড়া, হাঁস-মুরগী বেচতে আসতো শহরে, ব্যবসায়ীরা তাদের মালপত্রের বোঝা গাধার পিঠে চাপিয়ে দোকানে দোকানে ঘুরে বেড়াতো, কুটারশিল্পগুলিতে লেগে থাকতো কারিগর-শিক্ষানবিশের ভীড়, রাজমন্ত্রীরা শহরের জীবনযাত্রা বাড়িম্বর বানাবার কাজে ব্যস্ত থাকতো, মেয়েরা রাস্তায় রাস্তায় নেচে বেড়াতো, পৌর প্রতিষ্ঠানের প্রধানেরা ও তাঁদের কর্মচারীরা, নরগকর্তাদের প্রতিনিধি শান্তিরক্ষকেরা ঘোড়ায় চড়ে টহল



মধ্যযুগীয় শহরের জীবনযাত্রা

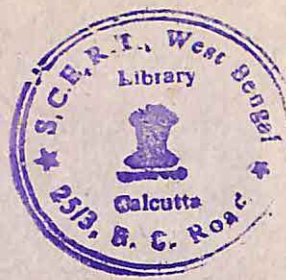
দিয়ে বেড়াতো। আত্মরক্ষার জন্য শহরগুলি প্রধানতঃ থাকতো দেয়াল-মেরা; আর প্রায় প্রতিটি বড় শহরই নিজেদের শান্তি আর নিরাপত্তা রক্ষার জন্য সেনাবাহিনী রাখতো। এর প্রধান অংশ ছিল শহরের

বিস্তারিত পরিবারের যুবকেরা,—এর সঙ্গে থাকতো মাইনে-করা সৈন্য। ক্রমে এইসব শহরের নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ আশ্রয়ে জ্ঞান-বিস্তার চর্চার কেন্দ্র গড়ে উঠতে থাকে এবং শহরগুলি সামন্ত-ভূস্বামীদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে। সামন্ত-ভূস্বামীদের আধিপত্য থেকে নিজেদের রক্ষার জন্যই শহরগুলি রাজশক্তিকে জোরদার আর কেন্দ্রীভূত করার চেষ্টার সঙ্গে, নিজেদের যুক্ত করতে থাকে। শহরগুলোর সমর্থনের জোরেই ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের রাজারা সামন্ত-ভূস্বামীদের আধিপত্য খর্ব করার কাজে ক্রমশঃ সাফল্যলাভ করতে থাকেন। কাজেই বলা চলে যে, নগর-সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে রাজশক্তির কেন্দ্রীভবনও দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে ইউরোপে।

তাই বলা যেতে পারে যে, দুশো বছর ধরে ইউরোপের খ্রীষ্টান সমাজ এশিয়ার মুসলমান রাজ্যগুলোর বিরুদ্ধে ক্রুসেড চালাবার ফলে সামন্তপ্রথার অন্ধকারে আচ্ছন্ন মধ্যযুগীয় ইউরোপে ত্রয়োদশ শতাব্দীর নবজাগৃতি সম্ভব হয়েছিল।

অনুশীলনী

- ১। ‘ক্রুসেড’ কাকে বলে? ‘ক্রুসেড’ নামকরণের কারণ কি? কাদের বিরুদ্ধে ক্রুসেড সংগঠিত হয় এবং কেন?
- ২। ক্রুসেড-এর ঘোষিত উদ্দেশ্য কি ছিল? প্রকৃতপক্ষে ক্রুসেড অভিযানের লক্ষ্য কি ছিল?
- ৩। কয়টি ক্রুসেড অঙ্গীকৃত হয়? সবচেয়ে সফল ক্রুসেড কোনটি? সবচেয়ে কলঙ্কজনক ক্রুসেড কোনটিকে বলা হয় এবং কেন?
- ৪। ইউরোপীয় খ্রীষ্টান-সমাজে ক্রুসেডের ফলাফল বর্ণনা কর। ‘ক্রুসেড ব্যর্থ হয়েও সফল’,—এই উক্তিটির তাৎপর্য বুঝিয়ে দাও।
- ৫। প্রধান প্রধান ক্রুসেডগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।
- ৬। ক্রুসেডের ফলে ইউরোপের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে যে ব্যাপক পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল তার পরিচয় দাও।
- ৭। ইউরোপে নগরের বিকাশ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত টীকা লেখো।
- ৮। ‘বোজু’ইম’ কাদের বলে? এই নামটির উৎপত্তির পরিচয় দাও।
- ৯। গিল্ড প্রথা কি? গিল্ড-প্রথার বরূপ বর্ণনা কর।



নবম অধ্যায়

মধ্যযুগে দূরপ্রাচ্য

[**সারসংক্ষেপ :** প্রাচ্যদেশে সপ্তম থেকে চতুর্দশ শতাব্দী সমাজ-সভ্যতার ক্ষেত্রে নূতন ধারার জন্ম দেয়। কেন্দ্রীভূত স্বৈরাচারী রাজশক্তির জায়গায় উপজাতি গোষ্ঠী-প্রধানদের বিকেন্দ্রিত শাসন অথবা সামন্ত ব্যবস্থা-নির্ভর সমাজব্যবস্থার উদ্ভব হয়। দূরপ্রাচ্যের চীন-জাপানেও দেখা দেয় এই ধারা। চীনে সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল বহু আগে, পৃথিবীর প্রাচীনতম নদীমাতৃক সভ্যতার আবির্ভাবের প্রায় সমকালে। কিন্তু জাপানের সভ্যতার বিকাশের অর্থাৎ কৃষিজীবী মানুষের স্থায়ী বসতি স্থাপনের ঘটনা ঘটে অনেক পরে, যীশুখ্রীষ্টের জন্মের সমসাময়িক যুগে। কিন্তু জাপান এক পাহাড়ঘেরা দ্বীপময় দেশ বলে, সভ্যতা-বিকাশের প্রায় প্রথম থেকেই এখানে সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বিকাশ ঘটেতে দেখা যায়। সপ্তম থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর ভেতর চীনে সভ্যতার বিকাশে যে অগ্রগতি ঘটেছিল জাপানে ঠিক তেমন ব্যাপক অগ্রগতির প্রকাশ নেই,—সভ্য জগতের জীবনধারা গড়ে তুলবার জন্য তাই জাপানকে চীনের সভ্য জীবনধারার অনুকরণ ও চীনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার পথ গ্রহণ করতে হয়েছিল।]

খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে চীনের ক্রীতদাস-নির্ভর জীবনধারায় সংকট দেখা দিলে হান সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। প্রাচীন চীনা সভ্যতার যুগের মধ্যে হান যুগ ছিল সবচেয়ে অগ্রসর। কিন্তু দাসশ্রমে নির্ভরশীল উৎপাদন-ব্যবস্থার দুর্বলতা চীনের স্বৈরাচারী রাজশক্তির কেন্দ্রীভূত শাসনের অবসান ঘটায়। পীত নদীর উপত্যকায় গড়ে-ওঠা হান সাম্রাজ্যের সীমার মধ্যে উই রাজ্য আর ইয়াংসি চীনে মধ্যযুগ উপত্যকায় উর আর শু রাজত্বের আবির্ভাব হয়।

ফলে মধ্যযুগের চীনে দুটি রাজত্বের সূত্রপাত হয়,—একটি উত্তরে আর একটি দক্ষিণে। দক্ষিণ চীনের অধিকাংশ অঞ্চলে তখনও কৃষিকার্য শুরু হয় নি, তাই এ অঞ্চলের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটে ধীরে ধীরে। কিন্তু উত্তরে আগে থেকেই জলসেচের সুব্যবস্থা

করে ব্যাপক কৃষিকার্য শুরু হয়েছিল আর যাযাবরদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য দুর্গ প্রভৃতি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও গড়ে উঠেছিল। ফলে এ অঞ্চলে শক্তিশালী রাজ্যের বিকাশ ঘটেছিল দ্রুতগতিতে। তাই এ অঞ্চলে সামন্ততান্ত্রিক শাসন ও উৎপাদন ব্যবস্থার উদ্ভব হয় প্রথম।

সপ্তম শতাব্দীতে (৬১৮-৯০৭ খ্রীষ্টাব্দ) টাং বংশের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় চীনে। তৃতীয় শতাব্দীতে হান বংশের পতনের পর থেকে চার শো বছর ধরে চীনে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় রাজ্য গড়ে না ওঠায় চীনের জনগণ বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। টাং বংশের সম্রাটরাই আবার উত্তর আর দক্ষিণ চীনকে একত্রিত করে এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি হয়, উন্নতি হয় শিল্পকলার আর সভ্য জীবনযাত্রার। এইজন্য টাং বংশের শাসনকালকে মধ্যযুগীয় চীনের স্বর্ণযুগ বলা হয়ে থাকে। টাংবংশের রাজত্বকালে চীনের সমাজ-সংস্কৃতি-সভ্যতা আর অর্থনৈতিক অবস্থার যেমন সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হয়েছিল মধ্যযুগে এমন উন্নতির নিদর্শন বিরল।

টাং রাজত্বকালে সর্বপ্রথম আইনের ধারাগুলো লিপিবদ্ধ করা হয়। এর আগে পর্যন্ত বিভিন্ন রাজবংশের আমলে প্রচলিত সামাজিক নীতি-নিয়ম আর রাজকীয় নির্দেশই ছিল দেশের আইন। কুং ফুটজু'র নীতিশাস্ত্রও অনেক পরিমাণে রাষ্ট্রীয় বিধি হিসাবে স্বীকৃত ছিল।

কিন্তু শাসন পরিচালনার জন্য নির্দিষ্ট আইনবিধি আইনের সংস্কার টাং-শাসনের আগে কখনও লিপিবদ্ধ হয় নি। টাং শাসনেই সর্বপ্রথম কৃষকের খাজনার সম্পর্কে নির্দিষ্ট আইন তৈরি হয় এবং খাজনা ও কর আদায়ের নিয়ম-কানুন রচিত হয়। সরকারী কর্মচারী নিয়োগের জন্য পরীক্ষা ব্যবস্থার রীতি এই সময়েই ব্যাপক-ভাবে প্রচলিত হয়।

শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি টাং যুগের আর এক উল্লেখযোগ্য অবদান। এই যুগেই রাজকীয় উৎসাহ এবং পৃষ্ঠপোষকতায় চীনা অভিজাত

শ্রেণী এবং সরকারী কর্মচারীদের ছেলেদের বিদ্যাচর্চার ব্যবস্থার উন্নতি সূচিত হয়। সরকারী চাকুরিতে নিয়োগের শিক্ষা ও বিদ্যাচর্চা জন্ম প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত হওয়ায় উচ্চতর শ্রেণীর মানুষদের মধ্যে বিদ্যাচর্চার যে আগ্রহ সৃষ্টি হয় তার ফলেই টাং বংশের শাসনকালে চীনে জ্ঞানচর্চায় উৎসাহ দেখা দিয়েছিল। এই যুগেই চীনে প্রথম বই ছাপার পদ্ধতি প্রচলিত হওয়ায় বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে অগ্রগতির সুযোগ ঘটে। এই সময় গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি ক্ষেত্রে নানা আবিষ্কার করেন চীনা পণ্ডিতরা। ভূগোল এবং ইতিহাস রচনাও এসময় বিশেষ উন্নতিলাভ করে।

টাং যুগ চীনের গীতিসাহিত্যের স্বর্ণযুগ। এই বংশের শাসনকালেই চীনের বিখ্যাত কবি লি-পো (৭০১-৭৬২ খ্রি:), পো-চুই (৭৭২-৮৬৪ খ্রি:) ছু-ফু আবিভূত হন। লি-পো ছিলেন তাওগস্থী কবি; লোকালয়ের বাইরে, নির্জন পার্বত্য অঞ্চলে তিনি দীর্ঘকাল অতিবাহিত করেন।

তাই তাঁর কবিতায় নির্জন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যপ্রেম, কাব্য ও সাহিত্য মানবজীবনের নশ্বরতার বেদনা প্রকাশ পেয়েছে।

তিনি বৈষয়িক উন্নতির প্রতি উদাসীন ছিলেন বলে সরকারী চাকরির পরীক্ষা কখনও দেন নি। কোন রাজকীয় পদেও তিনি কোনদিন যোগ দেন নি। পো-চুই ছিলেন একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী। তিনি সরকারী পত্ররচনা সম্পর্কে মূল্যবান বইও লিখেছেন। পো-চুই ছিলেন বৌদ্ধ। তাঁর কাব্যে দরিদ্র, অবহেলিত মানুষের জন্ম গভীর সমবেদনা প্রকাশ পেয়েছে। তিনি মনে করতেন যে, সরকারী শাসন নীতিকে প্রভাবিত করে জনগণের কল্যাণে পরিচালিত করা কবির কর্তব্য। এই যুগে টাং চুয়ান-চাই নামে গল্প গ্রন্থও প্রকাশিত হয়।

টাং যুগে কবি-সাহিত্যিকদের খুব মর্যাদা ছিল। কবি-সাহিত্যিকদের সরকারী চাকুরিতে অগ্রাধিকার দেওয়া হত। যাঁরা কবিতা লিখতেন তাঁদের সমাজে খুব সম্মান দেখানো হত।

টাং যুগে সংগীত, চিত্রকলা, চারুশিল্পের ব্যাপক উন্নতি হয়েছিল।

বিদেশী, বিশেষ করে ভারতীয় সংগীত ও চিত্রকলার প্রবল প্রভাব পড়েছিল এ যুগের চীনা সংগীত ও চিত্রকলার ওপর। এর ফলে চীনের সংগীত ও চিত্রকলায় এক নূতন সাংস্কৃতিক ধারা যুক্ত হয়। টাং যুগেই প্রাকৃতিক দৃশ্যের সার্থক চিত্র অঙ্কনের মহান ধারার সূত্রপাত হয়েছিল।

এই সব নিসর্গ চিত্র অঙ্কনে চীনা শিল্পীরা প্রকৃতির সৌন্দর্যসুখমার রূপটি



টাং যুগের চিত্রকলা

ভেতর তুনহুয়াং-এর পর্বতগুহায় পাথর কেটে মূর্তি নির্মাণ ও গুহার দেওয়ালে চিত্রাঙ্কন শুরু হয়। বুদ্ধের জীবনকাহিনীর চিত্র অঙ্কনে আর নানা আকারের বুদ্ধমূর্তি নির্মাণে এই গুহাগুলিকে ব্যবহার করা হয়েছিল।

টাং যুগেই সর্বপ্রথম চীনদেশে চেয়ারের ব্যবহার প্রচলিত হয়। এর সঙ্গে সঙ্গে অগ্ন্যাত্ত আসবাবপত্র, পোশাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতিতেও পরিবর্তন দেখা দেয়। এ যুগের তৈরী চীনা মাটির বাসনপত্র নকশার সৌন্দর্যে,

শিল্পকর্ম মসৃণতা ও উজ্জলতায় আগের যুগের চীনা মাটির

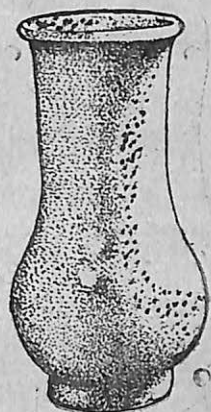
বাসনপত্রকে হার মানায়। এ থেকে বোঝা যায় টাং যুগে বাসন-শিল্প খুব উন্নত হয়েছিল। এই সময় সর্বপ্রথম বইপত্র ছাপার কাজ শুরু হয়। কাঠের টুকরার ওপর চীনা অক্ষর খোদাই করে তারপর সেগুলোকে ঠিকভাবে সাজিয়ে তার ওপর কালি মেখে

কাগজের ওপর ছাপ তুলে নেওয়া হত। ফলে এ সময়ে সর্বপ্রথম ছাপা বই বেরুতে আরম্ভ করে। তাই পড়াশোনার চর্চা, বইলেখার কাজ প্রভৃতি বিশেষভাবে উৎসাহিত হয়। লেখার কাজে তুলি ব্যবহারের প্রচলনও টাং যুগ থেকেই শুরু হয়েছিল।

টাং যুগেই প্রথম চীনে চায়ের ব্যবহার শুরু হয়। আজকাল পৃথিবীর সমস্ত দেশেই চায়ের ব্যবহার প্রচলিত হয়েছে, নানা দেশে ব্যাপকভাবে চায়ের চাষও চলছে। কিন্তু এই চায়ের ব্যবহার প্রথম প্রচলিত হয় চীনে। কাগজ,

রেশম, বই ছাপা, বারুদ :
চায়ের ব্যবহার

তৈরি প্রভৃতি কাজে যেমন চীন সারা দুনিয়াকে পথ দেখিয়েছে, চা খাওয়া আর চায়ের উৎপাদনেও চীন সারা পৃথিবীর পথপ্রদর্শক। টাং যুগেই চা-পান চীনে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং এর ফলে চাল আর যব থেকে তৈরি মদ্যপানের রীতি ক্রমাগত কমে যায়।



টাং যুগের চীনা মাটির
ফুলদানী

টাং যুগে ব্যবসা-বাণিজ্যেরও খুব উন্নতি হয়। নানা দেশ, প্রধানতঃ ভারত আর পারস্যদেশ থেকে বণিকেরা নানারকম মূল্যবান জিনিস নিয়ে চীনে বাণিজ্য করতে আসতে থাকে। আসবাবের জগৎ সুন্দর

কাঠ, মুগি মুক্তা, সুগন্ধি দ্রব্য, মসলা, নানারকম নূতন
ব্যবসায়-বাণিজ্য

ধরনের খাবার প্রভৃতি এই সব ব্যবসায়ীরা চীনে নিয়ে আসতো আর চীন থেকে নিয়ে যেত রেশমী কাপড়, চীনা মাটির সুন্দর বাসন-পাত্র, কারুকার্য-করা কাঠের জিনিস ইত্যাদি। ফলে এ-যুগে চীনের বৈদেশিক বাণিজ্যে খুব উন্নতি হয়।

রাজ্যের শাসনব্যবস্থায় উন্নতির ফলে এবং জমির খাজনা হ্রাস, জলসেচ-ব্যবস্থার উন্নতি আর কৃষকদের উপর সামন্ত-ভূস্বামীদের চরম আধিপত্য খর্ব করার ফলে কৃষকেরা চাষবাসে অধিক মনোযোগী হয়।

এ ছাড়া, দক্ষিণ চীনে স্থায়ী শাসনব্যবস্থা এবং শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত

কৃষিকার্য

হবার ফলে সে অঞ্চলে কৃষিকার্য সম্প্রসারিত হতে

আরম্ভ করে। তাই টাং বংশের শাসনকালে চীনে

কৃষিকার্যের ব্যাপক উন্নতি হয়, শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং কৃষক-বিদ্রোহ কমে যায়। এ সময় ব্যবসায়ী, কুটিরশিল্পী ও কারিগর এবং ক্রীতদাসদের মধ্যে ব্যাপকভাবে জমি বিলি করা হয়, ফলে সামন্ত-ভূস্বামীদের আধিপত্য থেকে মুক্ত কৃষকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং কৃষি-উৎপাদনও এর জন্য অনেক পরিমাণে বেড়ে যায়।

খ্রীষ্টধর্ম যে সময় ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ছিল, প্রায়, সেই সময়েই চীনে বৌদ্ধধর্ম ছড়িয়ে পড়তে আরম্ভ করে। পণ্ডিতদের ধারণা এই যে, সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম ভারত থেকে

চীনে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। কিন্তু ইউরোপে যেমন

বৌদ্ধধর্ম

খ্রীষ্টধর্ম সেখানকার মানুষের প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসকে

সম্পূর্ণ মুছে দিয়েছিল, চীনে কখনও তা হয় নি। চীনের মানুষদের মধ্যে তাদের প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে পাশাপাশি বৌদ্ধধর্ম প্রসারিত হয়। তাওবাদ, কনফুসিয়াস-মতবাদ এবং বৌদ্ধ ধর্মমত একই সঙ্গে চীনে প্রচলিত থাকে। এই তিন ধর্মমত পরস্পরের সঙ্গে মিলেমিশে 'তিন মতবাদ' নামে চীনের মানুষদের মধ্যে পরবর্তী দু'হাজার বছর প্রচলিত ছিল। টাং বংশের রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্ম রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল। ফলে নানা চীনা পণ্ডিত বৌদ্ধধর্মের প্রকৃত স্বরূপ জানবার জন্যে সে সময় ভারতে এসেছেন। এদের মধ্যে হুয়েন সাং, ইংসিং অন্যতম।

ভারতের ইতিহাসে হুয়েন সাং এক স্মরণীয় নাম। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে তিনি ভারতে এসেছিলেন। প্রাচীনকাল থেকে

হুয়েন সাং যে পথে চীনের সঙ্গে পশ্চিম এশিয়া ও ভারতের

বাণিজ্য চলতো সেই পথেই তিনি ভারতে আসেন।

এই পথে তাঁকে কাশগড়, খোটান, ইয়ারকন্দ প্রভৃতি ভারতীয় উপনিবেশ পেরিয়ে আসতে হয়। তারপর তিনি দীর্ঘ চৌদ্দ বছর

ভারতে কার্টান, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ গ্রহণ করেন, ভারতের নানাস্থান দর্শন করেন এবং তারপর একই পথে স্বদেশে ফিরে যান। দেশে ফিরে ছায়েন সাং তাঁর ভারত ভ্রমণ-বৃত্তান্ত রচনা করেন। তাঁর এই রচনা সে-কালের চীনা পণ্ডিতদের মনে বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল। তার ফলেই টাং যুগের সঙ্গীত ও শিল্পকলায় ভারতীয় সংগীত ও শিল্পকলার প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়।

টাং রাজাদের রাজধানীর নাম ছিল চাং-আন (আধুনিক সিয়ান)। বর্গাকৃতি এই নগর দেওয়াল দিয়ে ঘেরা ছিল। প্রধান রাস্তাগুলোর পাশে ছিল গাছের সারি। শহরটা আবার দেওয়াল দিয়ে কয়েকটা ভাগে ভাগ করা ছিল। বড় বড় ফটক বা দরজা টাং-রাজধানী : দিয়ে এক অংশ থেকে অন্য অংশে যাওয়া-আসার ব্যবস্থা ছিল। দরজাগুলো রাত্রে বন্ধ করে দেওয়া হত। এই শহরে দশ লাখের বেশি মানুষ বাস করতো। এশিয়ার নানা দেশ থেকে মানুষ আসতো এই শহরে প্রধানতঃ ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্য।

টাং যুগেই চীনা সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রভাব কোরিয়া, জাপান আর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কোন কোন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। কোরিয়ায় কনফুসিয়াস ও বুদ্ধের বাণী চীন থেকেই প্রচারিত হয়। চীনের সামন্ত-ব্যবস্থা কোরিয়ার প্রাচীন সমাজ জীবনকে বদলে দেয়। জাপান টাং যুগের আইনবিধি, ভূমি-রাজস্ব এবং সামন্তব্যবস্থার টাং চীনের প্রভাব অনুকরণে সে দেশের শাসন ও সমাজব্যবস্থাকে নূতন রূপ দেয়। বৌদ্ধধর্মও চীন থেকেই জাপানে প্রবেশ করে এবং পরবর্তিকালে সবচেয়ে শক্তিশালী ধর্মমতে পরিণত হয়। ভিয়েতনাম দীর্ঘকাল টাং বংশের অধীন ছিল এবং এর ফলেই সেখানে চীনা সামন্তব্যবস্থা, ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা প্রভৃতি চীনের অনুকরণেই গড়ে ওঠে। পরবর্তিকালে ভিয়েতনামে চীনের শাসন লুপ্ত হয়ে গেলেও সমাজব্যবস্থায় চীনা প্রভাব অপরিবর্তিত থেকে যায়।

টাং রাজারা রাজ্যজয়ের জন্য ক্রমাগত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকায়

রাজ্যের অর্থনীতি দুর্বল হয়ে পড়তে থাকে আর সামন্ত-ভূস্বামীরা নানা রকম সুযোগ-সুবিধা রাজার কাছ থেকে আদায় করে নিতে আরম্ভ করে। এর ফলে কৃষকদের উপর অত্যাচার-জুলুম টাং-বংশের পতন বাড়তে থাকলে ৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে কৃষকরা এবং টাং শাসনাধীন উপজাতিগুলো বিদ্রোহী হয়ে ওঠে আর ছাং চাও উপজাতি টাং রাজধানী চাং-আন অধিকার করে। এই বিদ্রোহ দমন করা হলে সামন্তপ্রভুরা আরও শক্তিশালী হয়ে উঠে উত্তর ও দক্ষিণ চীনে ছোট ছোট রাজ্য গড়ে তোলে আর টাং সাম্রাজ্যের পতন হয় (৯০৭ খ্রীঃ)।

টাং রাজত্বের পতনের পর সামন্ত রাজাদের মধ্যে ক্রমাগত যুদ্ধ-বিগ্রহ চলতে থাকে এবং ৯৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পাঁচটি রাজবংশ চীনের নানা অঞ্চলে ছোট ছোট রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। চীনের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নষ্ট হয়ে যায়, সাধারণ মানুষের ওপর শোষণ ও অত্যাচার বাড়তে থাকে, মেয়েদের পা বাঁধবার প্রথা শুরু হয়। অবশেষে ৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে সুং বংশ চীনে এক বৃহদাকার সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। এই সাম্রাজ্য তিনশো বছর (৯৬০-১২৬০ খ্রীঃ) চীনে রাজত্ব করে, শুধু মাঝখানে কয়েক বছর সুং বংশের শাসনে ছেদ পড়েছিল।

সুং রাজাদের প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য আকারে টাং বংশের সাম্রাজ্য থেকে ছোট ছিল, কিন্তু শিল্প-সাহিত্যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি-বিকাশে নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনে টাং যুগের চেয়ে এতটুকু পশ্চাৎপদ ছিল না। ৩০ বৎসরের যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে চীনের অর্থনৈতিক ও

রাজনৈতিক জীবনে যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল সুং সাম্রাজ্যের বৈশিষ্ট্য তাকে দূর করবার জন্য সুং সম্রাটেরা যুদ্ধ-বিগ্রহের নীতি বর্জন করেছিল। যাযাবর জাতিগোষ্ঠীর

আক্রমণ বন্ধ করবার জন্য সুং রাজারা যাযাবর গোষ্ঠীনেতাদের টাকা-পয়সা দিয়ে বশীভূত করেন। ফলে যাযাবরদের আক্রমণ ক্রমে ক্রমে বন্ধ হয়ে যায়। সুং সাম্রাজ্যের অধিকাংশ অঞ্চলে প্রধান চীনা জাতি-গোষ্ঠী হানদের বাস ছিল বলে ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্যগঠনে সুবিধা হয়।

শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় সামন্ত-ভূস্বামীদের বিরোধিতার ফলে সুং রাজারা সামন্ত-ব্যবস্থার আধিপত্য চূর্ণ করতে কৃতসংকল্প হন। তাই সামন্ত-ভূস্বামীদের শাসনকার্যের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে স্থায়ী সরকারী কর্মচারীদের নিয়োগ করা শাসন সংস্কার হয়; শহরগুলোর শাসন পরিচালনার দায়িত্ব উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের হাতে অর্পণ করা হয়। সামন্ত ও ব্যবসায়ীদের হাত থেকে জমি কেড়ে নিয়ে আগেকার মত রাষ্ট্রীয় জমিদারী গড়ে তোলার চেষ্টাও সুং রাজারা করেছিলেন, কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয়নি।

সামন্ত-ভূস্বামীদের সামাজিক আধিপত্য খর্ব করবার জন্য সুং রাজারা সাধারণ কৃষকদের শক্তিবৃদ্ধির চেষ্টা করেন। এইজন্য যে সব কৃষক প্রত্যক্ষভাবে রাজাকে খাজনা দিত, তাদের আর্থিক সহায়তার জন্য ঋণদান ব্যবস্থা এই যুগে প্রচলিত হয়। সুং রাজাদের এই সব সংস্কারের ফলে চীনে সামন্ত ব্যবস্থার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে জমিদারী ব্যবস্থার উদ্ভব হয়। জমিদারেরা তাদের জমি খাজনার বিনিময়ে কৃষকদের মধ্যে বিলি করতো এবং চড়া হারে খাজনা আদায় করতো। এই যুগেই সর্বপ্রথম সম্পত্তির উপর সরকারী কর ধার্য করা হয়,— এই কর থেকে কৃষকদেরও অব্যাহতি ছিল না। এই সমস্ত সংস্কারের কালে সামন্ত-ভূস্বামীদের শক্তি দুর্বল হলেও কৃষকদের ওপর শোষণের মাত্রা কিন্তু বেড়ে যায়। জমিদারের চড়া খাজনা আর রাজার করভার তাদের অর্থনৈতিক জীবনকে আরও অসহ্য করে তোলে।

অন্যদিকে জমিদারী প্রথা প্রবর্তনের ফলে দেশে এক বিভ্রাবন মধ্যস্থত্বভোগী শ্রেণীর আবির্ভাব হয়। এদের অর্থনৈতিক অবস্থা সচ্ছল ছিল; এদের ভেতরেই বিভার্জনের আগ্রহ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। এদের মধ্যে থেকেই প্রতিযোগিতা-পরীক্ষার মাধ্যমে সরকারী কর্মচারী নিযুক্ত হতে থাকে। ফলে সুং রাজত্বকালে চীনে এক সংস্কৃতিবান বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয়। এই শ্রেণী একদিকে জমি থেকে অনর্জিত আয় লাভ করতো, অন্যদিকে রাজ্যের প্রধান

প্রধান সরকারী চাকুরিতে নিযুক্ত হয়ে বেতন, সামাজিক মর্যাদা আর নানা সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতো।

চীনের সমাজ জীবনে এই শ্রেণীর জনসংখ্যা যত বাড়তে থাকে, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা, শিল্পকলা ও সাহিত্যচর্চা ততই বাড়তে থাকে। টাং যুগের শেষদিকে বই ছাপার কৌশল উদ্ভাবিত হয়েছিল। সুং যুগে

জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা : বিদ্যাচর্চার আগ্রহ বৃদ্ধির ফলে বই ছাপা উৎসাহ লাভ করে এবং বিদ্যাচর্চার সুবিধা বাড়িয়ে দেয়।

শিক্ষার প্রসার

ফলে দ্রুত শিক্ষার অগ্রগতি ঘটতে থাকে। নিরক্ষরতা

দূরীকরণ, জ্ঞানচর্চা, নাগরিক গুণের বিকাশ প্রভৃতির জন্য সুং বংশের শাসনকাল বিখ্যাত হয়ে আছে। টাং যুগে কুবিরা ছিলেন সমাজের সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তি, সুং যুগে গদ্য লেখকদের খ্যাতি ও মর্যাদা বেশি বৃদ্ধি পায়। এইজন্য ঐতিহাসিক ও দার্শনিকেরা এ যুগে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় ছিলেন। সুং-রাজত্বকালে উ ইয়াং লিও নামে একজন পণ্ডিত সর্বাধিক খ্যাতি লাভ করেন। তিনি ছিলেন সাহিত্যিক, দার্শনিক এবং প্রত্নতাত্ত্বিক। ঐতিহাসিক হিসাবেও তিনি বিখ্যাত ছিলেন। এই সময় চীনে বীজগণিতের চর্চা আরম্ভ হয়, বই ছাপার কৌশলে আরও উন্নতি ঘটে।

সুং-যুগ ছিল ব্যাপক শিল্প বিকাশের যুগ। চীনা মাটির বাসন নির্মাণশিল্প এ যুগেই সবচেয়ে বেশি উন্নত হয়েছিল। রঙে, উজ্জ্বলতায়, অলংকরণের নিপুণতায় ও সৌন্দর্যে সুং-যুগের চীনা মাটির বাসনের

শিল্পোন্নতি ও তুলনা নেই। চীনের নানা স্থানে রেশম-বস্ত্র, চীনা-

মাটির বাসন ও ধাতুজব্যবহার বহু শিল্পকেন্দ্র গড়ে

শহরের উদ্ভব ওঠে আর এইসব শিল্পকেন্দ্রকে ঘিরে একের পর

এক শহর প্রতিষ্ঠিত হতে আরম্ভ করে। চতুর্থ শতাব্দী থেকেই চীনে জ্বালানি হিসাবে খনিজ কয়লার ব্যবহার শুরু হয়েছিল। সুং বংশের শাসনকালে খনিজ কয়লার ব্যবহার ব্যাপক হওয়ায় কয়লা খনি-গুলোতে বহুলোকের কর্মসংস্থান হতে আরম্ভ করে। এ সময় ঢালাই লোহার উৎপাদনে চীন বিশেষ উন্নত হয়। কৃষিকার্যের যন্ত্রপাতি;

সেতু, মন্দির, বুদ্ধের মূর্তি, অস্ত্রশস্ত্র আর জাহাজ নির্মাণে ঢালাই লোহার ব্যাপক ব্যবহার দেখা দেয়। শিল্পোন্নতির ফলে চীনে উৎপাদক-সম্পদ বা গিল্ড প্রথা গড়ে ওঠে; এই গিল্ডগুলো শিল্পী-কারিগরদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে নানানভাবে সহায়তা করতো।

ইউরোপে গিল্ড প্রথা যেমন স্বায়ত্তশাসিত শহর গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল, সুং-যুগের চীনে কিন্তু গিল্ডগুলো সে সুযোগ পায় নি। কিন্তু সুং-আমলের চীনে একচেটিয়া রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় সামন্ততন্ত্রকে কেন্দ্রীয় রাজশক্তি জমিদারী প্রথা আর আমলা-শাসনের প্রবর্তন করে আগেই কোণঠাসা করে ফেলেছিল। তাই কারিগর-শিল্পী আর ব্যবসায়ী গিল্ডগুলো চীনে রাজার পৃষ্ঠপোষকতা পায়নি। বরং প্রধান প্রধান শিল্পে রাজা ছিলেন একচেটিয়া ক্রেতা। উৎপাদকদের রাজার কাছেই সমস্ত পণ্য বিক্রী করতে হত। দেশী-বিদেশী বাণিজ্যে সবটুকু মুনাফা রাজভাণ্ডারকে পুষ্ট করতো। রাজকীয় আয়বৃদ্ধির এই কৌশল চীনে স্বাধীন ও সমৃদ্ধ বণিকশ্রেণীর উৎপত্তির পথ রুদ্ধ করে দিয়েছিল। ফলে শিল্প শহরগুলোতেও রাজার আমলারাই প্রাধান্য পেতো।

সুং বংশের রাজাদের প্রথম রাজধানী ছিল কাইকেং। এই নগরটি পীত নদী থেকে কেটে আনা সেচখালের ওপর অবস্থিত ছিল। এই খালের সাহায্যে কাইকেং-এর সঙ্গে সমুদ্রতীরবর্তী বন্দর-নগরী হাংচাউ-এর যোগাযোগ স্থাপন করা হয়েছিল। সুং বংশের রাজধানী কাইকেং ক্রমে এক বিখ্যাত শিল্পকেন্দ্র হয়ে ওঠে।

এখানকার প্রধান শিল্প ছিল রেশম-বয়ন, ধাতুদ্রব্য এবং চীনা মাটির বাসন-শিল্প। এছাড়া এখানে লৌহশিল্প এবং খনিজ কয়লা উত্তোলন-কার্যও প্রধান হয়ে উঠেছিল। ১১২৬ খ্রীষ্টাব্দে যাযাবরদের আক্রমণে কাইকেং-এর পতন ঘটলে সুং বংশের রাজধানী হাংচাউ-এ স্থানান্তরিত হয়। সুং-রাজত্বকালে এই নগরী এত সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল যে, শতাব্দী

কালের মধ্যে হাংচাউ পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী ও সবচেয়ে জনবহুল নগরীতে পরিণত হয়। ১২৭৫ খ্রীষ্টাব্দে এই শহরের জনসংখ্যা ছিল দশ লক্ষ। এই শহরে নাগরিকদের আমোদ-প্রমোদের জন্য নাট্যশালা, সংগীত ও নৃত্যশালা ছিল। বাড়ীগুলো ছিল দু-তিন তলা উচু। উত্তর চীনের হিমশীতল আবহাওয়ার পরিবর্তে এখানকার জলবায়ু ছিল সুখকর। তাই এখানকার নাগরিক জীবন যেমন আনন্দময় ছিল, এখানে ব্যবসা-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধিও তেমনি খুব বেশী হয়েছিল।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে চেঙ্গিস খাঁর পরিচালনাধীনে যাযাবর মোঙ্গলজাতি শক্তিশালী হয়ে উঠে সমগ্র এশিয়া জুড়ে আধিপত্য বিস্তার করে। ক্রমে তাদের রাজ্যসীমা পশ্চিমে কিয়েভ ও পূর্বে কোরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। ১২৬৪ খ্রীষ্টাব্দে মোঙ্গলরা উত্তর-চীন অধিকার করে



কুবলাই খাঁ

কারাকোরাম থেকে কাশ্মীর (পিকিং)-এ তাদের রাজধানী সরিয়ে আনে। ১২৭৯ খ্রীষ্টাব্দের ভেতর মোঙ্গলরা সমগ্র চীন অধিকার করে এবং মোঙ্গল জাতির নেতা কুবলাই খাঁ (১২১৬-৯৪) কাশ্মীর থেকে সমগ্র মোঙ্গল সাম্রাজ্য শাসন

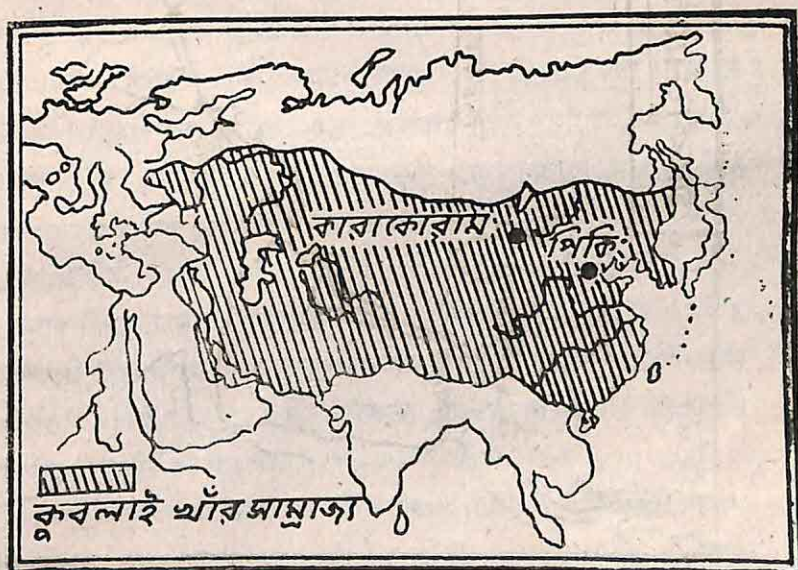
করতে থাকেন। ক্রমে মোঙ্গল সাম্রাজ্য এশিয়ার প্রশান্ত মহাসাগরের তীর থেকে ইউরোপের দানিযুব তীর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

প্রথম মোঙ্গলরা চীনের শাসনব্যবস্থার প্রচলিত রীতি অগ্রাহ্য করে উপজাতি গোষ্ঠী-ভিত্তিক সামন্ততন্ত্র প্রচলনের চেষ্টা করে। কিন্তু প্রধানতঃ চীনা কৃষকদের সামন্ত-শাসনাধীন করা অসম্ভব হয়ে ওঠায় মোঙ্গল শাসকেরা শেষ পর্যন্ত সূং যুগের আমলা-নির্ভর শাসন-ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন করে। কুবলাই খাঁ নিজে তীক্ষ্ণবর্তী বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন এবং তাঁর উদ্যোগেই চীনদেশে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম বিস্তারলাভ করলেও

তা চীনের জনজীবনে তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। চীনের প্রধান জাতিগোষ্ঠী হানদের মধ্যে কনফুসিয়াস বা কুং ফুৎজুর প্রবর্তিত ধর্মই প্রচলিত থাকে।

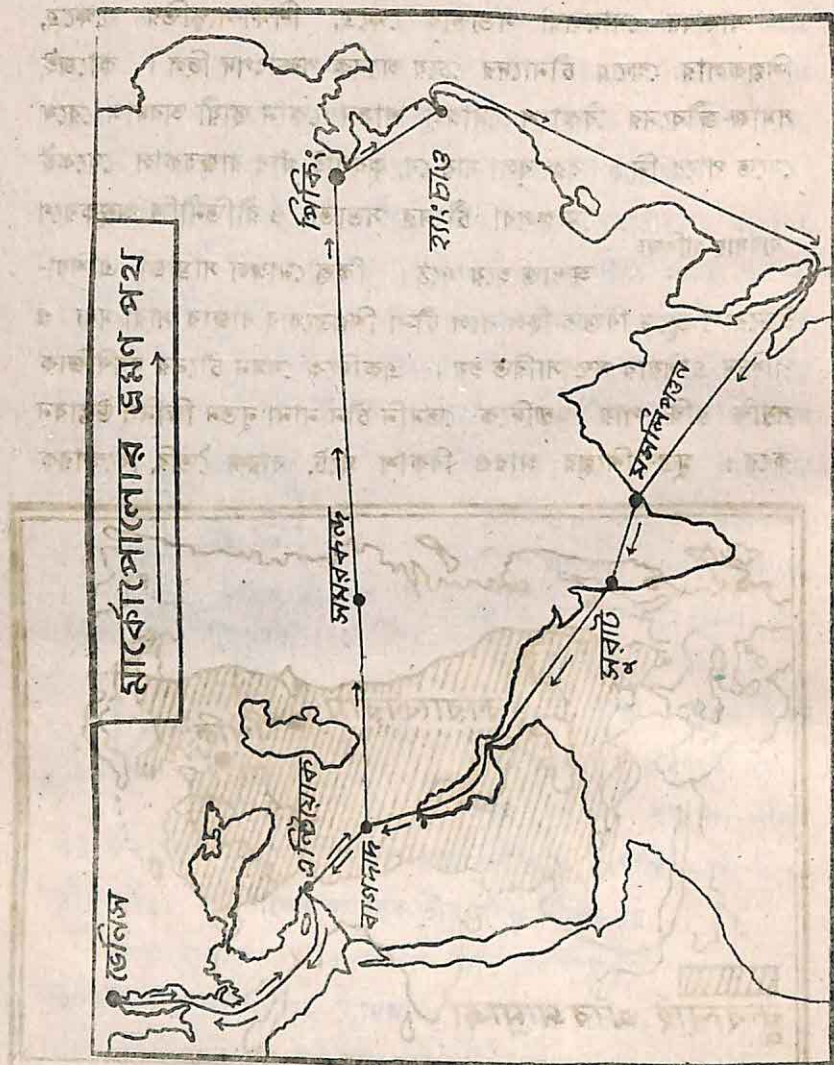
যাযাবর মোঙ্গলরা সভ্যতার ক্ষেত্রে, শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে, শিল্পকলার ক্ষেত্রে চীনাদের চেয়ে অনেক পশ্চাৎপদ ছিল। কাজেই সমাজ-জীবনের বিকাশে মোঙ্গল শাসন কোন স্থায়ী অবদান রেখে যেতে পারে নি। বরং বলা যায় যে, কুবলাই খাঁর রাজত্বকাল থেকেই মোঙ্গলরা চীনের সভ্যতা ও রীতিনীতি অনুকরণে ব্যবসায়-বাণিজ্য

অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু মোঙ্গল সাম্রাজ্য এশিয়া-ইউরোপ জুড়ে বিস্তৃত ছিল বলে চীনা শিল্পদ্রব্যের বাজার সারা মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ায় সম্প্রসারিত হয়। একদিকে যেমন চীনের বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায় অতৃদিকে তেমনি চীন নানা নূতন জিনিস উদ্ভাবন করে। মুদ্রণ-শিল্পের আরও বিকাশ ঘটে, বারুদ তৈরি, বিস্ফোরক



পদার্থ তৈরি প্রভৃতি ক্ষেত্রে চীন পৃথিবীকে নূতন জ্ঞান উপহার দেয়। বারুদের সাহায্যে বোমা, হাতবোমা, রকেট, কামান প্রভৃতি যুদ্ধাস্ত্র তৈরির কাজেও চীন পরবর্তিকালে বিশেষ দক্ষতা দেখায়।

মৌল্লরী শেষ পর্যন্ত চীনের শাসন-ব্যবস্থায় প্রচলিত আমলা-
তান্ত্রিক পদ্ধতি প্রবর্তন করলেও চীনাদের শাসনকার্যের দায়িত্ব থেকে
সরিয়ে দিয়ে মৌল্ল জাতি ও তার সহযোগী জাতিগোষ্ঠীর মানুষদের
শাসনক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল। চীনাদের তারা মোটেই বিশ্বাস



করতো না, নিতান্ত ঘৃণা আর অবহেলার চোখে দেখত। নানারকম
শোষণ আর অত্যাচারে চীনারা, বিশেষ করে হান্ জাতিগোষ্ঠীর
মানুষেরা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। বিক্ষুব্ধ চীনাদের দমন করে রাখা তাদের
পক্ষে ক্রমেই অসম্ভব হয়ে ওঠে, কারণ বিজিত চীনাদের তুলনায়

মোঙ্গলরা সংখ্যায় ছিল অত্যন্ত কম। ফলে, মাত্র একশো বছরের মধ্যেই (১৪৬৮ খ্রীঃ) বিদ্রোহী চীনারা মোঙ্গল রাজত্বের অবসান ঘটায়। চীনে মিং সাম্রাজ্যের পতন সূত্রপাত হয়।

১২৭১ খ্রীষ্টাব্দে দুইজন ভেনিসীয় বণিক চীনদেশ পর্যটনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তাঁরা ছিলেন দুই ভাই,—সঙ্গে ছিল একজনের ১৭ বছর বয়সী ছেলে মার্কো পোলো। ২০ বছর পর মার্কো পোলো স্বদেশে ফিরে আসেন। তাঁরা মোঙ্গল সম্রাট কুবলাই খাঁর রাজধানী পিকিং-এ পৌঁছেছিলেন। মার্কো পোলো তাঁর এই দুঃসাহসিক ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখে রেখে গিয়েছেন। এই ভ্রমণবৃত্তান্ত থেকে আমরা কুবলাই খাঁর রাজসভার নানা বিস্ময়কর বিবরণ মার্কো পোলোর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত জানতে পেরেছি। তিনি হ্যাংচাউ প্রমুখ নানা শহরের বিরাট সমৃদ্ধির বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর রচনায়।

তিনি বলেছেন যে হ্যাংচাউ নিঃসন্দেহে পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর এবং সবচেয়ে বড় শহর। তিনি আরও বলেছেন যে, ইয়াংসি নদী দিয়ে যে বিপুল পরিমাণ পণ্য চলাচল করে তা সমগ্র খ্রীষ্টান জগতের সমস্ত নদী-সমুদ্রে দিয়ে চলাচলকারী পণ্যের চেয়ে বহু পরিমাণে বেশি। তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত থেকে বোঝা যায় যে, মার্কো পোলো কুবলাই খাঁর রাজসভা এবং চীনের সমৃদ্ধি দেখে বিশেষভাবে অভিভূত হয়েছিলেন। তাঁর লেখার কিছু কিছু অতিরঞ্জিত আর আজগুবি গল্প থাকলেও তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তকে চীনের সভ্যতার প্রামাণ্য এবং নির্ভরযোগ্য বিবরণ বলে দীর্ঘকাল বিশ্বাস করা হত। সম্ভবতঃ বহু কুবলাই খাঁর রাজসভায় কাটিয়ে মার্কো পোলো স্বদেশে ফিরে আসেন।

জাপানের আদি ইতিহাস অন্ধকারে আচ্ছন্ন। মোটামুটি জানা যায় যে, এশিয়ার মোঙ্গল জাতিগোষ্ঠীর মানুষেরা জাপান : প্রাচীন কোরিয়া থেকে জাপানে গিয়ে বসবাস করতে শুরু করে। তাদের আগে জাপানের দ্বীপগুলোতে আইনু নামে এক অসভ্য জাতি বসবাস করতো। তাদের জাতি-

পরিচয় আজও ভালো করে জানা যায়নি। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী নাগাদ এরা মোঙ্গল জাতিগোষ্ঠীর মানুষদের অভিযানে বিতাড়িত হয়ে ক্রমে অত্যাচার জাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে মিশে যায়।

মোঙ্গল জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্গত ইয়ামাই নামে এক কৃষিজীবীগোষ্ঠী খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী নাগাদ জাপানের অত্যাচার উপজাতিগুলোকে নিজেদের অধীনে এনে এক রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। ইয়ামাতো রাজ্য : এরা প্রধানতঃ মধ্য হোনশু দ্বীপের ইয়ামাতো মিকাদো

উপত্যকায় বসতি করেছিল বলে এদের প্রতিষ্ঠিত রাজ্যকে ইয়ামাতো রাজ্য বলা হয়। এই ইয়ামাতো রাজ্যের শাসকরা ছিল উপজাতি-প্রধান। এদের ভেতর যে উপজাতি-প্রধান বংশানুক্রমে উপজাতির পুরোহিতের কাজ করতো, সেই বংশই ক্রমে রাজবংশে পরিণত হয়। এদের মনে করা হত সূর্যদেবী আমতোরাসু'র পুত্র; তাই জাপানীরা রাজাকে স্বর্গের দূত মনে করতো। এর ফলে জাপানের রাজার নাম হয় মিকাদো। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীতে জাপানের সমাজ গড়ে উঠেছিল কতকগুলো উপজাতি-গোষ্ঠী নিয়ে। প্রত্যেক গোষ্ঠী আবার কতকগুলো পরিবারে বিভক্ত ছিল। বিভিন্ন পরিবার সমাজের বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত থাকতো। কতকগুলো গোষ্ঠী

রাজার অধীনে রাজ্যশাসনের কাজ করতো। এদের সমাজব্যবস্থা

ভেতর থেকেই সৈন্য সংগৃহীত হত, আর অত্যাচার গোষ্ঠীগুলো কৃষিকার্য, কাপড় বোনা, মাটির বাসন তৈরি প্রভৃতি কাজ করতো। এই সমাজব্যবস্থা ক্রমে বংশগত হয়ে ওঠে এবং জাপানী সমাজে অভিজাত ও শ্রমজীবী শ্রেণীর উৎপত্তি হয়।

এই জাপানী মানুষেরা ছিল প্রকৃতি-পূজক। তাদের প্রধান দেবতা ছিল আমতোরাসু বা সূর্যদেবী। পরবর্তীকালে এই ধর্মের নাম হয় 'শিন্টো' ধর্ম, অর্থাৎ 'দেবতাদের পথ'। এই ধর্মের প্রধান পুরোহিতই তখন বংশানুক্রমে রাজার আসনে

স্বমেরাগী বংশ বসতো। প্রথমে রাজার ক্ষমতা বিশেষ সুনির্দিষ্ট ছিল না, অভিজাত গোষ্ঠীগুলির প্রাধান্যই ছিল বেশী। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ

শতাব্দীতে জাপানে সুমেরাগী বংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে রাজকীয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ক্রমে রাজার একাধিপত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ফলে শেষ পর্যন্ত রাজ্যের শাসনক্ষমতা সোঙ্গা গোষ্ঠীর হস্তগত হয়।

এই সময়ে জাপানে বৌদ্ধধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটতে আরম্ভ করে প্রধানতঃ কোরিয়া আর চীন থেকে। সোঙ্গা গোষ্ঠী নিজেদের আধিপত্য জোরদার করবার জন্য শিন্টো ধর্মের পরিবর্তে বৌদ্ধধর্মের বিস্তারের প্রতি আগ্রহ প্রদর্শন করতে আরম্ভ করে। বৌদ্ধধর্মের বিস্তারের ভেতর দিয়েই সংস্কৃতির প্রভাব

জাপানে চীনের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক প্রভাব বিস্তৃত হতে শুরু করে। ৫৯৩ খ্রীষ্টাব্দে শোটোকু-তাইশি নামে একজন অভিজাত নেতা জাপানের সিংহাসনে আসীন রানীর মন্ত্রী নিযুক্ত হন। তিনি চীনের শাসনব্যবস্থার খুব অনুরাগী ছিলেন এবং চীনের শাসনব্যবস্থা অনুসরণ করে জাপানে অনুরূপ শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের চেষ্টা করেন। তিনি চীন ও এশিয়া থেকে শিল্পী-কারিগরদের এনে জাপানে বসবাস করাবার উদ্যোগ নেন এবং চীনা ও কোরীয় ভাস্কর্য আর শিল্পরীতি জাপানে প্রবর্তন করেন। এর পর থেকে দেড়শো বছর ধরে চীনা শিল্প-সংস্কৃতির ব্যাপক অনুকরণ শুরু হয়। এ সময় সমস্ত রাজকীয় দলিল-পত্র রচনায়, রাজসভার কথাবার্তায় ও রাজকার্যে চীনা ভাষার ব্যবহার প্রচলিত হয়। এরপর যখন জাপানী ভাষার ব্যবহার আবার শুরু হয় তখন চীনা বর্ণমালার সাহায্যেই জাপানী ভাষার পুস্তকাদি লিখিত হতে থাকে। ফলে জাপানে নূতন বর্ণমালার উদ্ভব হয়নি।

শোটোকু-তাইশি চীনের শাসনব্যবস্থার অনুকরণে জাপানে যে শাসনব্যবস্থার প্রচলন করেছিলেন তার ফলে জাপানের রাজা মিকাদোর হাতে রাজকীয় ও ধর্মীয় ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হলেও ক্রমে ক্রমে বৌদ্ধ সংঘগুলো বড় বড় জমিদারীর মালিক হয়ে ওঠে ও ইউরোপের সামন্তপ্রভুদের মত ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী হবার

চেষ্টা করতে থাকে। বৌদ্ধসংঘ কর্তৃক শাসন ক্ষমতায় প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা জাপানী অভিজাতরা প্রতিরোধ ক্ষমতার দ্বয় : করতে এগিয়ে আসে। এদের নেতা ছিল সোগা রাজা ও সামন্ত গোষ্ঠী,—যাদের প্রধান তখন রাজার আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই সংঘর্ষে সোগা গোষ্ঠীর হাত থেকে সুমেরাগী গোষ্ঠী আবার সিংহাসন কেড়ে নেয় এবং এর ফলে সামন্তদের হাতে শাসন-ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়।

সপ্তম শতাব্দীতে (৬৪৫ খ্রীঃ) জাপানের শাসনব্যবস্থায় নূতন সংস্কার সাধন করা হয়। এই সংস্কারকে **তাইকোয়া সংস্কার** বলা হয়। এই নূতন ব্যবস্থা রাজার ক্ষমতাবৃদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট মনে না হওয়ায় ৭০১ খ্রীষ্টাব্দে **তাইহো বিধি** প্রবর্তিত হয়। এই বিধি অনুসারে রাজাকে দেশের সকল ভূমির মালিক বলে ঘোষণা করা হয়। কর দেওয়া, রাজার প্রয়োজনে বিনা

শাসন সংস্কার :
কৃষকদের ভূমি-
দান

মজুরিতে কাজ করা আর বংশানুক্রমে জমি চাষ করতে বাধ্য থাকার শর্তে কৃষকদের জমি ভোগের সুবিধা দেওয়া হয়। এর ফলে

কৃষকেরা রাজার ভূমিদাসে পরিণত হয়ে সমাজের দরিদ্রতম শ্রেণী হয়ে ওঠে। এই ভূমি-সংস্কারের ফলে জাপানের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শান্তি ও সমৃদ্ধির সূচনা ঘটে। ৭১০ খ্রীষ্টাব্দে রাজধানী নারা নামক স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল বলে জাপানের ইতিহাসে এই যুগকে **‘নারায়ুগ’** বলে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। এ সময় চাষবাসের উন্নতি হয়, সেচব্যবস্থার সম্প্রসারণ ঘটে, ধানের চাষ, খনিজ পদার্থের উদ্ভোলন এবং নগর জীবনের উন্নতি হয়। আইনগুলো এই সময়েই লিপিবদ্ধ হয়, দেশের ঘটনাবলীর ইতিহাস রচনা শুরু হয় এবং উল্লেখযোগ্য সাহিত্য গ্রন্থাদি রচিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রীয় জীবনে রাজার প্রাধান্য বাড়বার জন্তে জাপানের সিংহাসনে আসীন রাজাকে সূর্যদেবীর বংশধর প্রমাণের জন্ত নানা কল্পিত কাহিনীও রচিত হয়। কিন্তু ভূমি-ব্যবস্থার এই সংস্কারের ফলে কৃষকদের ওপর শোষণ তীব্র

হতে থাকে, করভার ক্রমাগত বাড়তে থাকে। আইন অনুসারে সব জমির মালিকের সমান হারে খাজনা দেবার কথা থাকলেও ক্ষমতাশালী অভিজাত সামন্ত-ভূস্বামীদের সব সময় করভার থেকে

অব্যাহতি দেওয়া হত আর রাজস্বের পরিমাণ যাতে কৃষকের হৃদশা : না কমে যায় সেজন্ত কৃষকের কাছ থেকে বেশি বৌদ্ধসংঘের শক্তিবৃদ্ধি করে কর আদায় করা হত। ফলে কৃষকেরা

জমি ছেড়ে দলে দলে পালিয়ে যেতে থাকে আর এই পরিত্যক্ত জমি অধিকার করে নিয়ে বৌদ্ধসংঘগুলো এত ক্ষমতাশালী হয়ে উঠে যে, শেষ পর্যন্ত ৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে বৌদ্ধসংঘের আধিপত্য থেকে মুক্ত হবার জন্য সম্রাট নারা থেকে কিস্যোটোতে রাজধানী সরিয়ে আনতে বাধ্য হন।

কিস্যোটোতে রাজধানী স্থানান্তরের পর দেড়শো বছর পর্যন্ত জাপানের রাজসভায় চীনা-সংস্কৃতির প্রভাব ছিল খুব প্রবল। রাজ-কার্যে চীনা ভাষা ব্যবহৃত হত, রাজার সভাসদেরা চীনা ভাষায় কবিতা রচনা করতেন। নবম শতাব্দীতে কোবোদাইশি নামে একজন পণ্ডিত চীনা অক্ষরে লেখা জাপানী ভাষার গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার করেন। তখন থেকে জাপানী ভাষার আদর বেড়ে যায় এবং সাহিত্য রচনায়, সরকারী কাজে জাপানী ভাষার ব্যবহার প্রচলিত হয়।

চীনের অনুসরণে জাপানের শাসনব্যবস্থায় স্থায়ী আমলাতন্ত্রের প্রবর্তন করা হলেও জাপানে সরকারী আমলাদের পরীক্ষার ভিত্তিতে নিয়োগ করা হত না। এখানে অভিজাত পরিবারের ছেলেদের উচ্চ

সরকারী পদে নিয়োগ করা হত। যে পরিবারের অভিজাত আমলাতন্ত্র প্রভাব-প্রতিপত্তি রাজদরবারে যত বেশি থাকতো সেই পরিবারের বা গোষ্ঠীর মানুষেরাই সরকারী

উচ্চপদে অগ্রাধিকার পেত। অনেক ক্ষেত্রে একই পরিবার থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিযুক্ত হত। এর ফলে সামন্ত ভূস্বামী আর অভিজাত গোষ্ঠী-প্রধানদের আধিপত্য শাসনব্যবস্থার ওপর ক্রমাগত বেড়ে যেতে থাকে। সাম্রাজ্যের স্বার্থরক্ষায় বা সম্রাটের

ক্ষমতারূদ্ধিতে সাহায্য করার পরিবর্তে এইসব পদস্থ সরকারী কর্ম-চারীরা অভিজাত গোষ্ঠী ও সামন্ত ভূস্বামীদের স্বার্থ আর আধিপত্য রক্ষায় বেশি তৎপর থাকতো।

বৌদ্ধ সংঘের প্রভাব থেকে রাজ্যের শাসনব্যবস্থাকে মুক্ত করার জন্য নবম শতাব্দীতে কোবোদাইশি আর দেঙ্গিওদাইশি নামে দুইজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী শিংগন আর টেংডাই নামে দুটি নূতন বৌদ্ধ মতের প্রবর্তন করেন। প্রথম মতের ভেতর দিয়ে জাপানের শিটো ধর্ম আর বৌদ্ধধর্মের এক সমন্বয় সাধন করা হয়। ফলে এই ধর্মমত অনুসারে সম্রাট বা মিকাদোকে দেবতার বংশধর বলে স্বীকার করে তাঁর প্রতি পূর্ণ আনুগত্যের নীতিকে বৌদ্ধধর্মের নির্দেশ বলে ঘোষণা করা হয়।

এইভাবে রাজ্যের শাসনব্যবস্থায় বৌদ্ধসংঘের পুতুল সম্রাট আধিপত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টাকে প্রতিরোধ করা সম্ভব হলেও জাপানী অভিজাত পরিবারের ক্ষমতারূদ্ধি বন্ধ করা সম্ভব হয়নি। ফলে রাজ্যের শাসনক্ষমতা কার্যতঃ ফুজিওয়ারা পরিবারের হাতে চলে যায়। সম্রাট এবং রাজপরিবারকে জাপানের মানুষেরা দেবতার অংশ মনে করে শ্রদ্ধাভক্তি দেখালেও শাসনের ব্যাপারে সম্রাট ফুজিওয়ারা গোষ্ঠী-প্রধানদের হাতের পুতুল হয়ে পড়েন। এই পরিবার সপ্তম শতাব্দীর চীম-ঘেঁষা অভিজাত গোষ্ঠীর নেতা ছিল এবং সে সময় শাসনকার্যে প্রাধান্য লাভ করে প্রচুর ধনসম্পত্তির অধিকারী হয়। দশম শতাব্দীতে এই পরিবার রাজা-যুবরাজদের সঙ্গে নিজেদের পরিবারের মেয়ে বিয়ে দিয়ে রাজধানীর প্রকৃত কর্তা হয়ে

বসে। সম্রাট মারা গেলে অপ্রাপ্তবয়স্ক সম্রাটকে ফুজিওয়ারা পরিবার সিংহাসনে বসিয়ে তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে এরা নিজেদের ইচ্ছামতো রাজ্যশাসন করতো। রাজ্যের সমস্ত প্রধান প্রধান পদ এই পরিবারের হাতে চলে যায়। ফুজিওয়ারা গোষ্ঠীর লোকেরা ছাড়া অন্য অভিজাত সামন্ত গোষ্ঠীর যোগ্যতম লোককেও রাজ্যের শাসনব্যবস্থায় ঢুকতে দেওয়া হত না। এর ফলে অন্যান্য অভিজাত গোষ্ঠীগুলি তখন জাপানের দূরবর্তী অঞ্চলে গিয়ে বড় বড়

জমিদারী গড়ে তুললো এবং নিজেদের শক্তিশালী সামরিক গোষ্ঠীতে রূপান্তরিত করলো।

দ্বাদশ শতাব্দীতে এই সামন্ত ভূস্বামীরা আর তাদের দুর্ধর্ষ সৈন্যদল (সামুরাই) শক্তিশালী হয়ে উঠলে ফুজিয়ারা গোষ্ঠীর প্রধানেরা

রাজধানী রক্ষার ও রাজ্যের শাসনক্ষমতা রক্ষার
 সামরিক এক-
 নায়কত্ব : শোগুন জন্ম টায়রা গোষ্ঠীর সমরনেতাদের সাহায্য গ্রহণ
 করে। কিন্তু মিনামোটে গোষ্ঠীর সামন্ত সর্দাররা

১১৮৫ খ্রীষ্টাব্দে দান-নো-উরার নো-যুদ্ধে টায়রা গোষ্ঠীকে পরাজিত
 করলে জাপান সাম্রাজ্যে ফুজিয়ারা পরিবারের আধিপত্য ধ্বংস হয়
 এবং মিনামোটে গোষ্ঠীর প্রধান যোরিতোমা শাসন ক্ষমতা অধিকার
 করে জাপ-সম্রাটের কাছ থেকে শোগুন বা প্রধান সেনাপতির মর্যাদা
 আদায় করে জাপানে সামরিক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। ক্রমে
 শোগুনের পদটি বংশানুক্রমিক হয়ে ওঠে। ফলে জাপানে দ্বৈত
 শাসনব্যবস্থা প্রচলিত হয়। সম্রাট হলেন নামসর্বস্ব শাসক, অর্থাৎ
 তাঁর নামেই সাম্রাজ্য শাসিত হত, কিন্তু দেশের প্রকৃত শাসনকার্য
 পরিচালনা করতেন শোগুন। এই শাসনব্যবস্থা জাপানে উনবিংশ
 শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত প্রচলিত ছিল।

দ্বাদশ শতাব্দীতে জাপানে সমরনায়কদের যে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়
 তার ভিত্তি ছিল অশ্বারোহী বর্মাবৃত সৈন্য বা সামুরাই। সামন্ত

জমিদার আর উপজাতি-প্রধানদের বংশধরদের ভেতর
 সামুরাই থেকেই জন্ম নেয় সামুরাই যোদ্ধা। সামুরাইরা

ঘোড়াকে ইম্পাতের বর্ম পরাতো না, দীর্ঘ ঢাল বা লম্বা, ভারী বর্শা
 ব্যবহার করতো না। তাদের অস্ত্র ছিল বড় বড় ধনুক ; এগুলি দিয়ে
 তারা ঘোড়ার ওপর থেকে তীর ছুঁড়তো। এছাড়া লম্বা, ধারালো
 তরোয়াল আর তীক্ষ্ণধার খাটো তরবারিই ছিল তাদের যুদ্ধের
 হাতিয়ার। ইউরোপের নাইটদের মত যুদ্ধই ছিল তাদের একমাত্র পেশা,
 যুদ্ধেই ছিল তাদের আনন্দ। তাই সে সময় সামুরাইরা এক দুর্ধর্ষ
 সামরিক শক্তি হয়ে উঠেছিল।

জাপানী 'সামুরাই' শব্দের অর্থ 'সেবক'। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, সামুরাইরা ভাড়াটে সৈন্য ছিল না। নেতার প্রতি, রাজার প্রতি পূর্ণ-আলুগতোর সংকল্প নিয়ে তারা সামুরাই হত। তাই ইউরোপের নাইটদের ভেতর যেমন মহান বীরধর্মের আদর্শ গড়ে উঠেছিল,

বুশিদো সামুরাই যোদ্ধাদের মধ্যেও বীরধর্ম সবচেয়ে প্রিয় ছিল। জাপানী সামুরাইদের বীরধর্মকে বলা হত বুশিদো, অর্থাৎ বীরের নীতি। সাহস, আলুগত্য আর নিষ্ঠা ছিল 'বুশিদো'র মূলকথা। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল স্ত্রী-জাতির প্রতি শ্রদ্ধা, সম্রাট ও মাতৃভূমির প্রতি ভালবাসা। 'বুশিদো' সামুরাই যোদ্ধাদের শিখিয়েছিল পরাজয়ের অসম্মান থেকে বীরের মর্যাদা রক্ষার জন্য আত্মহত্যা করতে। এই আত্মহত্যার প্রথাকে জাপানী ভাষায় হারাকিরি বলা হয়।

বীর যোদ্ধার সম্প্রদায় ও তাদের বীরধর্মের ফলে জাপানে যে যুদ্ধ-প্রবণতা গড়ে উঠেছিল তা সে-যুগের জাপানে নানা বীর-কাহিনীর জন্ম দেয়। এসব কাহিনী ভ্রাম্যমাণ অন্ধ গায়কেরা এক ধরনের বীণায় বাজিয়ে গেয়ে বেড়াতে। ইউরোপের চারণ কবিদের চারণ কবি মতো এরাও ছিল খুব জনপ্রিয় এবং সম্মানিত ব্যক্তি। রাজসভায় পর্যন্ত এদের অবোধ প্রবেশাধিকার ছিল। এই প্রথা জাপানে আধুনিক যুগেও প্রচলিত ছিল।

অঙ্গুলীলতা

- ১। কোন সময় থেকে চীনে মধ্যযুগের সূত্রপাত হয়? এই যুগের সমাজ-ব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্য কি?
- ২। টাং বংশ কত খ্রীষ্টাব্দে চীনে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে? টাং-যুগের শাসন-কালকে চীনা সভ্যতার স্বর্ণযুগ বলা হয় কেন?
- ৩। হুয়েন সাং কে ছিলেন? ইতিহাসে তাঁর নাম বিখ্যাত কেন?
- ৪। সুং-রাজত্বের শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর। এই সময় চীনে মধ্যবিস্তৃত শ্রেণীর জন্ম হয়েছিল কেন? সুং-যুগের চীনে শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার উন্নতির পরিচয় দাও।

৫। রাষ্ট্রীয় জমিদারী ও একচেটিয়া রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য কাকে বলে? চীনে কোন সময় এইসব ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছিল? এর ফলাফল বর্ণনা কর।

৬। সুং-আমলে চীনের শিল্পকলা ও ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতির বিবরণ লেখ। সুং আমলের রাজধানী হাংচাউ-এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

৭। চীনে মোঙ্গল অধিকার প্রতিষ্ঠার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। মোঙ্গল শাসনকালে চীনের বৈষয়িক উন্নতির পরিচয় দাও।

৮। জাপানে চীনা-সংস্কৃতির প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার বিবরণ লেখ।

৯। প্রাচীন জাপানে সমাজ-ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

১০। শোগুন কাকে বলে? শোগুনের উদ্ভবের ফলে জাপানের শাসন ব্যবস্থার কি পরিবর্তন হয়?

১১। 'সামুরাই' কারা? এদের কার্যকলাপ বর্ণনা কর।

১২। টিকা লিখ:—(ক) মার্কো পোলো, (খ) শিক্টো ধর্ম, (গ) ফুজিয়ারা পরিবার, (ঘ) তাইহো বিধি, (ঙ) বুশিদো।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী:—

১। (ক) জিন-পো আর পো-চুই এর পরিচয় দাও। (খ) টাং-যুগের সংগীত, চিত্রকলা ও চারুশিল্পের বিবরণ লিখ। (গ) বই ছাপার কাজ কোথায় কখন শুরু হয়? কিভাবে এই ছাপার কাজ করা হত? (ঘ) 'তিন মতবাদ' কাকে বলে? চীনে বৌদ্ধধর্ম কখন প্রচলিত হয়? (ঙ) টাং-সাম্রাজ্যের পতনের কারণ কি? (চ) গিল্ড-প্রথা কাকে বলে? চীনে গিল্ড-প্রথার পরিচয় দাও। (ছ) কুবলাই খাঁ কে? তিনি কিজন বিখ্যাত? (জ) শোটোরু তাইশি কে? তাঁর কৃতিত্বের পরিচয় দাও। (ঝ) নারা যুগ কাকে বলে? এই যুগের বৈশিষ্ট্য কি?

২। শূন্যস্থান পূর্ণ কর:—

(ক) —খ্রীষ্টাব্দে মার্কো পোলো চীন ভ্রমণে সাত্রা করেন।

(খ) জাপানী—বীরধর্মকে বুশিদো বলা হত।

(গ) জাপানী ভাষায়—শব্দের অর্থ—।

(ঘ) —খ্রীষ্টাব্দে টাং সাম্রাজ্যের পতন হয়।

(ঙ) সুং বংশ—বছর চীনে রাজত্ব করে।

(চ) —রাজাদের রাজধানীর নাম চাং-আন।

(ছ) টাং যুগ চীনের—স্বর্ণযুগ।

দশম অধ্যায়

মধ্যযুগের ভারত

[সংক্ষিপ্তসার :—আনুমানিক ৪৫৮ খ্রীষ্টাব্দে যাযাবর হুণ উপজাতির ভারত অভিযান শুরু হয়, আর তার ফলে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। ইউরোপে হুণ অভিযান ঘটেছিল প্রায় সমকালে, আর তার পরোক্ষ ফল হল রোমান সাম্রাজ্যের পতন। এইভাবেই পঞ্চম শতাব্দী থেকেই ভারতেও মধ্যযুগের সূত্রপাত হয়েছিল বলে ঐতিহাসিকেরা সিদ্ধান্ত করেছেন। কিন্তু রোমান সাম্রাজ্যের পতন ও জার্মান জাতির পশ্চিম ইউরোপে বসতি স্থাপনের ফলে সমগ্র পশ্চিম ইউরোপ জুড়ে ব অন্ধকারের যুগ নেমে এসেছিল, ভারতে হুণ অভিযান মেরুকম বিধ্বংসী তাণ্ডব সৃষ্টি করতে পারে নি। কিন্তু এর ফলে ভারত-জোড়া একরাট সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে ছোট ছোট রাজ্যের সৃষ্টি হয়। মৌর্য-গুপ্ত যুগের ঐক্যবদ্ধ রাজশক্তির তায় পরবর্তী ছ'শো বছরে আর কোন একরাট সর্বভারতীয় শক্তির উদ্ভব হতে পারে নি। তাই উত্তর-পশ্চিম থেকে আগত তুর্কী অভিযানের ডেউ ভারত প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হয়।]

পৃথিবীর ইতিহাসে বার বার দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে, বর্বর যাযাবরদের হাতে সভ্য মানুষেরা মার খায়, তাদের গড়া সমাজ-সভ্যতা ভেঙে যায়, আর সেই ধ্বংসযন্ত্রপের ভেতর থেকে নূতন যুগের নূতন সমাজ-ব্যবস্থা মাথা তোলে। মানুষের ইতিহাসের গুপ্তযুগের অবসান
মধ্যযুগের আরম্ভ
আদি ও মধ্যযুগ এই ভাঙাগড়ারই ইতিহাস। ভারতে হিন্দু সংস্কৃতি-সভ্যতার চরম বিকাশ হয়েছিল গুপ্তযুগে, আবার এই গুপ্তযুগেই যাযাবর হুণেরা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পেরিয়ে ভারতের বুকে অভিযান শুরু করে। এর ফলে একদিকে যেমন গুপ্তসাম্রাজ্য চূরমার হয়ে যায় অতীতকে তেমনি হিন্দুসভ্যতা-সংস্কৃতির অগ্রগতিও থেমে যায়।

মধ্য এশিয়া থেকে একদল হুণ চতুর্থ শতাব্দীতে ব্যাকট্রিয়া বা বাহলীক রাজ্য অধিকার করে এবং হিন্দুকুশ অতিক্রম করে ভারতে অভিযানের চেষ্টা করতে থাকে। গুপ্তসম্রাট স্কন্দগুপ্তের শাসনকালে হুণদের ভারতে প্রবেশের সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পর

ভারতে হুণ
অভিযান

(আনুমানিক ৪৬৭ খ্রীঃ) গুপ্তসাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়লে পঞ্চম শতাব্দীতে হুণেরা উত্তর ভারতে প্রবেশ করে।

ভারতে যে হুণেরা প্রবেশ করেছিল তাদের নেতা তোরমাণ আফগানিস্তানের বামিয়ানে রাজধানী স্থাপন করে এক শক্তিশালী রাজ্য গড়ে তোলেন। পারস্যের অংশবিশেষ, আফগানিস্তান, ভারতের

উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল এবং মধ্য এশিয়ার খোটান অঞ্চল
হুণরাজ্য

পর্যন্ত এই হুণরাজ্যের সীমা বিস্তৃত ছিল। তাঁর পুত্র মিহিরকুল (৫২০ খ্রীঃ) এই রাজ্যকে পূর্বে কাশ্মীর ও দক্ষিণে মধ্যভারতের এরাণ পর্যন্ত প্রসারিত করেন। অবশ্য সে সময়েও যে গুপ্তরাজারা এককভাবে এবং অগাধ ভারতীয় রাজাদের সহযোগিতায় হুণদের ভারত থেকে তাড়িয়ে দেবার জন্য প্রবল চেষ্টা করেছিলেন তার পরিচয় মধ্য ভারতের নানা শিলালিপি থেকে পাওয়া যায়। মান্দাসোরের প্রতাপশালী রাজা যশোধর্মণের কাছে হুণরাজ মিহিরকুলের পরাজয়ের বিবরণও এই সব শিলালিপি থেকে পাওয়া যায়। শেষ পর্যন্ত মিহিরকুলের রাজ্য উত্তর-পশ্চিম ভারত ও কাশ্মীরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। ৫৪২ খ্রীষ্টাব্দে মিহিরকুলের মৃত্যু হলে হুণেরা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ক্রমে ভারতের অধিবাসীদের সঙ্গে মিশে গিয়ে নিজেদের জাতি-বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে।

কিন্তু ভারতে হুণ অভিযানের প্রতিক্রিয়া এখানেই শেষ হয় নি। প্রবল হুণ আক্রমণের ফলেই ভারত-জোড়া শক্তিশালী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। ভারতে গড়ে ওঠে কতকগুলো ছোট-বড় রাজ্য, যাদের রাজারা একচ্ছত্র সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার

আকাঙ্ক্ষায় নিজেদের ভেতর অনবরত যুদ্ধ চালিয়ে
হুণ অভিযানের
প্রতিক্রিয়া ভারতের সামরিক শক্তিকেই ক্রমাগত দুর্বল করে
ফেলতে থাকে। দেশবাসীর চেতনাতেও আসমুদ্র-

হিমাচল ভারতরাত্রের কল্পনা ক্রমে ক্রমে মিলিয়ে যায়। এই বিশৃঙ্খলা ও রাজনৈতিক অস্থিরতা আরও বেড়ে যায় হুণ ও অগাধ উপজাতির ভারতে অনুপ্রবেশ এবং এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে

অভিযানের ফলে। এইসব বর্বর উপজাতির অনুপ্রবেশের ফলে বহু মানুষকে জন্মভূমি ছেড়ে ভারতের অন্তর ছড়িয়ে পড়তে হয়। এইভাবে বহু মানুষের স্থানান্তর গমনাগমনের ফলে নানা জাতিগোষ্ঠীর নানা সাংস্কৃতিক ধারা ভারতীয় জনজীবনকে প্রভাবিত করে। এরা রাজস্থানের স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে মিশে গিয়ে কালক্রমে যে রাজপুত জাতির সৃষ্টি করেছিল, ভারতের পরবর্তিকালের ইতিহাসে তারা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

গুপ্তসম্রাট স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পর (আঃ ৪৬৭ খ্রীঃ) প্রায় শতাব্দীকাল গুপ্তরাজারা উত্তর ভারতে এক প্রধান শক্তি হিসেবে রাজত্ব করেন, কিন্তু ভারতব্যাপী যে একাধিপত্য গুপ্ত সাম্রাজ্যের অবসান গুপ্ত সম্রাটদের ছিল তা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা আর তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। গুপ্তসম্রাট বৃহগুপ্ত সার্বভৌম শক্তি হিসেবে গুপ্তসাম্রাজ্যকে আবার প্রতিষ্ঠিত করবার শেষ চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর (৫৪৪ খ্রীঃ) গুপ্তসাম্রাজ্যের ক্ষমতা দ্রুত লোপ পায় আর উত্তর ভারতে নানা ছোট-বড় স্বাধীন রাজ্য গড়ে ওঠে। এর পরেও প্রায় একশো বছর গুপ্তবংশের রাজারা উত্তর ভারতের নানা স্থানে তাঁদের অস্তিত্ব রক্ষার চেষ্টা করেন। মগধে গুপ্ত বংশীয়দের শাসন (পরবর্তী গুপ্তবংশ) সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত যে অব্যাহত ছিল তা আদিত্যসেনের শিলালিপি থেকে জানা যায়।

গুপ্তসাম্রাজ্যের পতনের পর উত্তর ভারতে যে সব স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হয় তার ভেতর কাশ্যকুজের মৌখরী বংশ, বলভীতে মৈত্রক বংশ এবং থানেশ্বরে পুষ্যভূতি বংশ প্রধান। এই সব রাজ্যের ভেতর মৈত্রক বংশ সবচেয়ে বেশি সময়, অর্থাৎ অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাকলেও থানেশ্বরের পুষ্যভূতি বংশই উত্তর ভারতে প্রধানতম শক্তি হয়ে ওঠে এবং ভারতে আবার একরাট সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে।

পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে অথবা ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমদিকে

প্রভাকরবর্ধন দিল্লীর কাছে থানেশ্বরে **পুষ্পভূতি বংশের** রাজ্য প্রতিষ্ঠা

করেন। গুর্জর ও হুণদের পরাজিত করে তিনি মালব

পুষ্পভূতি বংশ :

প্রভাকরবর্ধন

ও গুজরাট অধিকার করেন ও নিজ রাজ্যসীমা

বাড়িয়ে তোলেন। তাঁর বংশের বিস্তারিত পরিচয়

জানা যায় নি। কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন যে, প্রভাকর-

বর্ধনের পিতৃপুরুষ গুপ্তসাম্রাটদের ভট্টারকপাদীয় সামন্ত ছিলেন এবং

গুপ্তসাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়লে তাঁরা স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যুর পর তাঁর বড় ছেলে রাজ্যবর্ধন থানেশ্বরের

রাজা হন, কিন্তু তিনি গোড়বংশের রাজা শশাঙ্কের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত

ও নিহত হলে তাঁর ছোট ভাই **হর্ষবর্ধন** থানেশ্বরের সিংহাসনে বসেন

(৬০৬ খ্রীষ্টাব্দ)। রাজ্যাভিষেকের পরও তিনি **কুমার শিলাদিত্য**

নামেই পরিচিত হতেন। ৬১২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রাজা উপাধি গ্রহণ

করেন।

প্রভাকরবর্ধন তাঁর কন্যা **রাজ্যশ্রীকে** কাথুকুজের রাজা

গ্রহবর্মার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন। মালবরাজ

হর্ষবর্ধনের

রাজ্যবিস্তার

দেবগুপ্ত গ্রহবর্মাকে যুদ্ধে নিহত করে রাজ্যশ্রীকে

বন্দী করলে রাজ্যবর্ধন মালব আক্রমণ করে

দেবগুপ্তকে পরাজিত করেন,

কিন্তু গোড়বংশের রাজা

শশাঙ্ক দেবগুপ্তের সাহায্যে

এগিয়ে এলে রাজ্যবর্ধন তাঁর

হাতে পরাজিত ও নিহত

হন। হর্ষবর্ধন সিংহাসনে

বসে শশাঙ্কের বিরুদ্ধে

অভিযান করেন। কিন্তু

তিনি শশাঙ্ককে পরাজিত

করতে পারেন নি। ৬১৯



হর্ষবর্ধনের প্রতিকৃতি-অঙ্কিত মুদ্রা

(আ) খ্রীষ্টাব্দে শশাঙ্কের মৃত্যুর পর ভাস্করবর্মণ গোড়ের রাজধানী

কর্ণস্বৰ্ণ অধিকার করেন এবং হর্ষবর্ধন মগধ ও উত্তরবঙ্গে নিজের অধিকার স্থাপন করেন।

হর্ষবর্ধন উচ্চাভিলাষী ছিলেন, তাই তিনি ভারতব্যাপী একরাট সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। কিন্তু উত্তর ভারতের বৃহত্তর অংশে ছাড়া ভারতের অত্র তিনি রাজ্যবিস্তারে সফল হন নি। পাঞ্জাবের পূর্ব অংশ, মথুরা, উত্তর প্রদেশ, বিহার এবং গোড়বঙ্গ তাঁর শাসনাধীন ছিল। সারা ভারতের সম্রাট খ্যাতি লাভ করা সে সময় এতই অসম্ভব মনে হত যে, তাঁর কৃতিত্বের বর্ণনায় কয়েকটি শিলালিপিতে তাঁকে শুধুমাত্র ‘সকলোত্তরপথেশ্বর’ বলে অভিহিত করা হয়েছে। গুপ্তসম্রাটরা ভারতে যে সামন্ত ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন তা এতই দৃঢ়মূল হয়েছিল যে, তার প্রভাবকে চূর্ণ করে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন সারা ভারতে গড়ে তোলা সে যুগে আর সম্ভব ছিল না।

তবু একথা সত্য যে, গুপ্তসাম্রাজ্যের পতনের পর উত্তর ভারতে যে রাজনৈতিক শূন্যতা দেখা দিয়েছিল, হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস তাকে সাময়িকভাবে দূর করতে পেরেছিল।

বিখ্যাত চীনা পর্যটক ‘হুয়েন সাং’-এর ভারত ভ্রমণ হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালের এক খুব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত থেকে আমরা খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর ভারতের এক নির্ভরযোগ্য বিবরণ পাই। ৬৩০ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে তিনি তুংছ্যাং, খোটান, কাশগড়

হয়ে গান্ধার অঞ্চলে পৌঁছান, তারপর সেখান থেকে
হুয়েন সাং-এর
ভ্রমণবৃত্তান্ত
ভারতে প্রবেশ করে ভারতের নানা অঞ্চলে ভ্রমণ
করেন এবং ৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারত থেকে যাত্রা করে

৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে স্বদেশে ফিরে যান। এই দীর্ঘ সময়ের ভেতর তিনি কাশ্মীর, শিয়ালকোট, নেপাল, বঙ্গদেশ, কাশ্মীর, কামরূপ, কান্তকূজ প্রভৃতি নানাস্থানে ভ্রমণ করেন, ভাস্করবর্মা ও হর্ষবর্ধনের রাজসভায় কিছুকাল কাটান এবং নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘকাল বৌদ্ধধর্মশাস্ত্র ও ভারতীয় দর্শন অধ্যয়ন করেন।

হুয়েন সাং তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে সে যুগের ভারতের এক চমৎকার

পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি ভারতবাসীর সততা ও সরলতার প্রশংসা করেছেন। ভারতীয়দের সরল জীবনযাত্রা, অমশীলতা ও ধর্মাত্মবোধের কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। তাঁর রচনা থেকে সেকালের বন্দর তাম্রলিপ্তর বা গিজিক সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতের অধিবাসীদের পরমত-সহিষ্ণুতা, নানা ধর্মের প্রতি হৃদয়বর্ধনের সমদর্শিতা প্রভৃতির বর্ণনাও তিনি লিখে গিয়েছেন। তিনি ভারতের অনেক প্রাচীন নগর স্বচক্ষে দেখেছিলেন। এই সব নগরের শিল্পসমৃদ্ধি, সম্পদশ্রীর কথা, তিনি লিখতে ভোলেন নি।

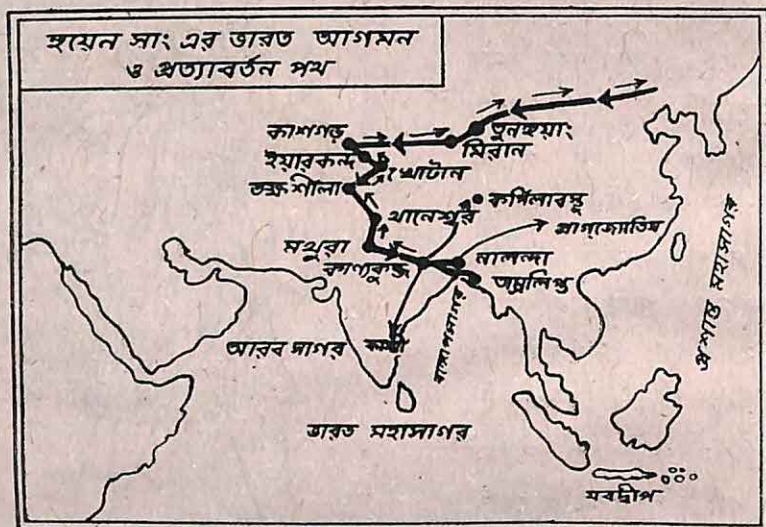


হয়েন সাং

তক্ষশীলা, পুরুষপুর, পাটলিপুত্র প্রভৃতি এককালের বিখ্যাত স্থানগুলির ধ্বংসস্থপ দেখে তিনি অবাক হয়েছিলেন, বারাণসীর ঐশ্বর্য, দেবমন্দির ও মূর্তির সৌন্দর্য তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। হৃদয়বর্ধনের রাজধানী কাশ্যকুজের শোভা-সম্পদের বর্ণনা, সেখানে অনুষ্ঠিত বৌদ্ধ মহাসংগীতির বিবরণ, প্রয়াগে ৭৫ দিনব্যাপী 'মহামোক্ষ উৎসবের' পরিচয় আমরা তাঁর রচনা থেকেই জানতে পারি।

এ ছাড়া, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ণ পরিচয়ের জন্মও হয়েন সাং-এর ভ্রমণবৃত্তান্ত আমাদের কাছে এক মূল্যবান ইতিহাস। অবশ্য, পরবর্তিকালে আর এক চীনা পণ্ডিত ইং-সিং-এর রচনা থেকেও আমরা

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ণ পরিচয় জানতে পারি। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে পরবর্তী গুপ্তরাজাদের উদ্যোগে ও নালন্দা বিশ্ব-বিদ্যালয় পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধ সংঘারাম নালন্দা বিহার প্রতিষ্ঠিত হয়। সেকালের মগধের অন্তর্গত এবং মগধের প্রাচীন রাজধানী রাজগৃহের (বর্তমান রাজগীর) ছয়-সাত



মাইল উত্তরে নালন্দায় এই সংঘারামটি প্রতিষ্ঠিত হয়। একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি ও গৌরব অক্ষুণ্ণ ছিল। প্রভুতত্ত্ববিদেরা নালন্দায় খননকার্য চালিয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ভগ্নাবশেষ আবিষ্কার করেছেন তা দেখলে অবাক হতে হয়।

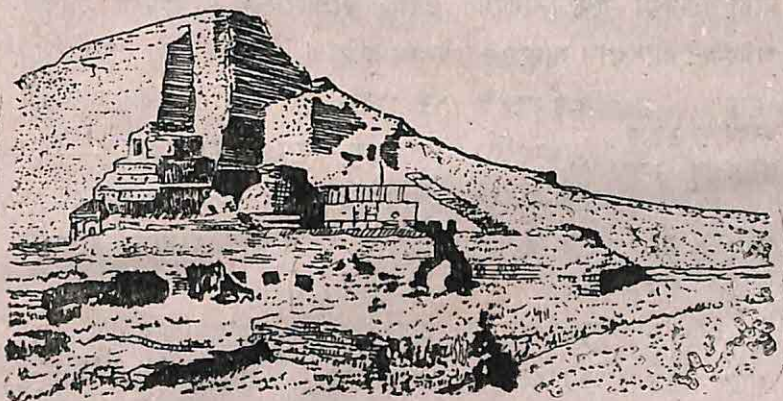
নানা রাজা ও শ্রেষ্ঠের উদার সাহায্যে গড়ে ওঠা এই বিশ্ববিদ্যালয় একটি নগরের মত হয়ে উঠেছিল। এখানে অন্ততঃ আটটি কলেজ বা আটটি বিদ্যালয় ছিল; এদের মধ্যে একটি তৈরি হয়েছিল ত্রিবিজয় (তুমাত্রা) দ্বীপের রাজা বালপুত্রদেবের দানে। হুয়েন সাং-এর বিবরণ থেকে জানা যায় যে, এর মধ্যে অন্ততঃ একটি ছিল চারতলা। নালন্দায় যশোবর্মদেবের যে শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে তাতে এই বিদ্যায়তনগুলোর শিল্প-স্থাপত্যের খুব প্রশংসা করা হয়েছে।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যাচর্চার নানারকম সুযোগ-সুবিধা ছিল। তিব্বতী গ্রন্থ থেকে আমরা জানতে পারি যে, এখানে **রত্ননাগর**, **রত্নোদধি** আর **রত্নরঞ্জক** নামে তিনটি বিরাট গ্রন্থাগার ছিল। দশ

হাজার ছাত্র ও শিক্ষক নালন্দায় অধ্যয়ন ও বিদ্যাচর্চার ব্যবস্থা অধ্যাপনা করতেন। ভারতের সমস্ত অঞ্চল থেকে, ও বিদ্যার্থী সমাবেশ

মধ্য এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, চীন, কোরিয়া প্রভৃতি দেশ থেকে এখানে শিক্ষার্থী জ্ঞান অর্জন করতে আসতো। এখানে যে কেবল বৌদ্ধধর্মশাস্ত্রের চর্চা হত তা নয়, হিন্দুধর্ম, দর্শন, ব্যাকরণ, আয়ুর্বেদ, জ্যোতির্বিজ্ঞান, চারুকলা প্রভৃতি বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থাও এখানে ছিল।

নালন্দার উদার শিক্ষাদর্শের পরিচয় পাওয়া যায় অধ্যক্ষের নির্বাচন থেকে। অধ্যক্ষ **ধর্মপাল** ছিলেন দক্ষিণ ভারতের লোক। তিনি



নালন্দার ধ্বংসাবশেষ

ছিলেন **কাঞ্চী** নগরীর অধিবাসী। ছয়ন সাং-এর গুরু নালন্দার বিখ্যাত অধ্যক্ষ মহাপণ্ডিত **শীলভদ্র** ছিলেন বাঙালী, বাংলাদেশের সমতট অঞ্চলের রাজপুত্র। আর এক বিখ্যাত আচার্য **জিনমিত্র** ছিলেন অন্ধ্রের অধিবাসী। তাই অনায়াসে বলা যায় যে, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকৃতপক্ষে ভারতের জ্ঞানসাধনার সার্থক পীঠস্থান ছিল,

তাই ভারতের সমস্ত অঞ্চল থেকে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার জন্য আহ্বান করা হত।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরও এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। দূর বিদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচার এবং বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রের সার্থক জ্ঞান বিতরণের জন্য নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় বিদেশী বৌদ্ধ শ্রমণদের শিক্ষিত করতো। তিব্বতী বিবরণ থেকে জানা যায় যে, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় সে দেশে বহু পণ্ডিত বৌদ্ধ শ্রমণ পাঠিয়েছিল। তাদের কয়েকজনের রচিত পুঁথি তিব্বতে সযত্নে রক্ষিত আছে। অষ্টম শতাব্দীতে শুভঙ্কর সিংহ নামে নালন্দার একজন পণ্ডিত চীনে গিয়েছিলেন এবং বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র চীনা-ভাষায় অনুবাদ করেন।

সপ্তম শতাব্দীতে হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর উত্তর ভারতের রাজনৈতিক এক্যের অবসান হয়। উত্তর ভারতের রাজশক্তিগুলো পরস্পরের মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে নিজেদের দুর্বল করে ফেলে। বিদেশী শক্তির আক্রমণ আশঙ্কার সামনেও এই সব রাজারা এক্যবদ্ধ হতে পারে নি।

এর ফলেই শেষ পর্যন্ত তুর্কী অভিযানের মুখে এই হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর উত্তর ভারত রাজ্যগুলো বিধ্বস্ত হয়ে যায়। হর্ষের মৃত্যুর পর উত্তর ভারতে যে সব রাজ্যের অভ্যুত্থান হয়েছিল তার ভেতর পশ্চিমে গুর্জর-প্রতিহার বংশ, গৌড়ে পালবংশ আর রাজস্থানে রাজপুত রাজারা অত্যন্তম।

হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর এবং ভারতে তুর্কী প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হবার আগে পর্যন্ত সাড়ে চারশো বছর ধরে রাজপুত রাজারা উত্তর ভারতে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। রাজপুতজাতির উৎপত্তি সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের ভেতর প্রবল মতভেদ আছে। তবে তাঁরা এ বিষয়ে

একমত যে, রাজস্থানের আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে রাজপুত জাতির হুণ ও তাদের সঙ্গে আসা যাযাবর জাতির মেলো-মেশার ফলেই এই দুর্ধর্ষ, যুদ্ধপ্রিয়, গোপ্তীগর্বে গর্বিত রাজপুত জাতির উদ্ভব হয়েছে।

রাজপুত জাতি প্রথমে চারটি প্রধান গোপ্তীতে বিভক্ত ছিল। এই

গোপ্তীগণুলো হল প্রতিহার, চাহমান বা চৌহান, চালুক্য বা শোলাঙ্কি, পরমার বা পাওয়ার। প্রতিহার বংশ রাজস্থানের দক্ষিণ অংশে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। চৌহান বংশ দিল্লীর দক্ষিণ-পূর্বে রাজস্থানের দক্ষিণ অংশে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। শোলাঙ্কি বা

চালুক্য বংশ গুজরাটের কাথিওয়াবাড় অঞ্চলে বিভিন্ন রাজপুত স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। এই গোপ্তীর নানা

বংশ শাখা মানব, চেদি, পাটন এবং ব্রোচ অঞ্চলে ছোট ছোট রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। পরমার বা পাওয়ার বংশীয় রাজপুতেরা ইন্দোরের নিকটবর্তী ধারা নামক জায়গায় রাজধানী প্রতিষ্ঠা করে।

এছাড়া পশ্চিম ও মধ্যভারতে আর যেসব রাজপুত গোপ্তী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল তারা নিজেদের সূর্যবংশীয় বা চন্দ্রবংশীয় বলে পরিচয় দিত। এদের মধ্যে চন্দেল্লা বংশীয়েরা খাজুরাহো অঞ্চলে প্রাধান্য বিস্তার করে। মেবারে গোহিলোট বা শোদীয়া রাজপুতগোপ্তী আরবদের বিরুদ্ধে গুর্জর প্রতিহার রাজাদের সঙ্গী হয়েছিল। তোমাররা ৭৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ঢিল্লিকা (দিল্লী) নগরী প্রতিষ্ঠা করে রাজত্ব করতে থাকে, পরে দ্বাদশ শতাব্দীতে চৌহানরা তাদের পরাজিত করে দিল্লী তাদের হাত থেকে কেড়ে নেয়। ত্রিপুরীর কলচুরি বংশ প্রতিহারদের সামন্ত-নৃপতি হিসাবে মধ্যভারতে আধিপত্য বিস্তার করে; পরে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে নবম শতাব্দীতে। গাহড়বাল বংশ কনৌজকে রাজধানী করে বারাণসী থেকে কনৌজ পর্যন্ত ভূভাগে রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে। এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা গোবিন্দচন্দ্র।

উপজাতি-গোপ্তীর ভিত্তিতে এই সব রাজপুত জাতিগুলো গড়ে উঠেছিল বলে প্রত্যেক গোপ্তীর অভ্যন্তরীণ একতা ছিল খুব প্রবল, কিন্তু গোপ্তীগণুলো একে অপরের সঙ্গে ক্রমাগত যুদ্ধ-রাজপুতদের গোপ্তী-বিগ্রহ চালিয়ে যেত। এদের গোপ্তীগত শত্রুতা বিরোধের ফল ছিল বংশানুক্রমিক, কখনই তা মিটতো না। ফলে এরা বীর, সাহসী এবং দুর্ধর্ষ যোদ্ধা হয়েও তুর্কী আক্রমণ প্রতিরোধ

করতে পারে নি। আর এদের হানাহানির ফলেই উত্তর ভারতে মুসলমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পথ সহজ হয়ে যায়।

হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর অষ্টম শতাব্দী থেকে দশম শতাব্দী পর্যন্ত উত্তর ভারতে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য পশ্চিম ভারতের গুর্জর প্রতিহার, পূর্বভারতের পাল ও দক্ষিণ ভারতের রাষ্ট্রকূট রাজবংশের মধ্যে তীব্র সংঘর্ষ চলতে থাকে। অষ্টম শতাব্দীতে রাষ্ট্রকূটরাজ দস্তিদুর্গ

এবং গুর্জর প্রতিহাররাজ প্রথম নাগভট্টের মধ্যে তিন-শক্তিঃ দশ প্রতিহার-পাল-রাষ্ট্রকূট যে যুদ্ধ হয় তাতে কোন পক্ষই বিশেষ সাফল্যলাভ করতে পারে নি। ৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে কনৌজ রাজ্যের উত্তরাধিকারের সমস্যাতে ভিত্তি করে প্রথম

নাগভট্টের পুত্র বৎসরাজের সঙ্গে গোড়বৎসের পালরাজা ধর্মপালের সংঘর্ষ হয়। এই যুদ্ধের ফলে ধর্মপাল কনৌজ অধিকার করেন ও তাঁর সমর্থনপুষ্ট ব্যক্তিকে কনৌজের সিংহাসনে স্থাপন করেন। বৎসরাজের পুত্র দ্বিতীয় নাগভট্ট সিংহাসনে বসবার পর আবার ধর্মপালের সঙ্গে সংঘর্ষ শুরু হয়। নাগভট্ট কনৌজ অধিকার করলে রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দ নাগভট্টকে আক্রমণ করে পরাজিত করেন এবং ধর্মপালের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হবার উদ্যোগ করেন। ধর্মপাল তৃতীয় গোবিন্দের কাছে আত্মসমর্পণ করায় রাষ্ট্রকূটরাজ যুদ্ধে নিরস্ত হন।

এই সব সংঘর্ষের ফলে গুর্জর প্রতিহার এবং রাষ্ট্রকূট উভয় শক্তিই দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে ধর্মপালের পুত্র দেবপালের হাতে রাষ্ট্রকূট এবং গুর্জর প্রতিহার বংশ পরাজিত হয়। এভাবে গোড়বৎসের পালবংশ উত্তর ভারতে সবচেয়ে শক্তিশালী রাজ্য হয়ে উঠলেও অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার ফলে পাল সাম্রাজ্য আর শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে নি। অতীতকালে রাষ্ট্রকূট রাজশক্তি দক্ষিণ ভারতের চালুক্যদের হাতে ধ্বংস হয় আর গুর্জর প্রতিহার রাজ্যের সামন্ত নৃপতিরাজশক্তির দুর্বলতার সুযোগে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে গুর্জর প্রতিহার রাজ্যের পতন ঘটায়। পশ্চিম ভারতের বিশাল গুর্জর প্রতিহার রাজ্য পাঁচটি ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত হয়ে

প্রতিহার, চৌহান, পারমার, চালুক্য ও গোহিলোট বংশের রাজপুত-শাসিত রাজ্যে পরিণত হয়।

আনুমানিক ৩২০ থেকে ৬৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বঙ্গদেশ গুপ্ত-সাম্রাজ্যের অধীন ছিল। গুপ্তসাম্রাজ্যের পতনের পর বঙ্গদেশে আবার নানা স্বাধীন রাজ্যের অভ্যুদয় হয়। এসব রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিল গৌড়, আর গৌড়ের অধীশ্বর **শশাঙ্ক**। তিনি

যে ঠিক কখন গৌড়রাজ্যের রাজা হয়েছিলেন তা বঙ্গদেশ : শশাঙ্ক জানা যায় নি। শুধু জানা যায় যে ৬০৬ খ্রীষ্টাব্দের

পূর্বে শশাঙ্ক গৌড়ের রাজা হয়েছিলেন এবং সম্ভবতঃ ৬৩৭-৩৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত গৌড়ের অধিপতি ছিলেন। বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার **বর্গমুর্ঘা** তঁার রাজধানী ছিল। তঁার রাজ্য কতবড় ছিল তা সঠিক-ভাবে জানা না গেলেও উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গ এবং মগধ যে তঁার শাসনাধীন ছিল তা নিশ্চিত জানা যায়। উত্তর ভারতের সবচেয়ে শক্তিশালী রাজা হর্ষবর্ধনের সঙ্গে শশাঙ্কের দীর্ঘকাল যুদ্ধবিগ্রহ হয়। সে যুগে উত্তর ভারতে প্রাধান্য লাভের জন্য বিভিন্ন রাজাদের ভেতর যে সব সংঘর্ষ ঘটেছিল এই সংঘর্ষ তাদের মধ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীকাল বাংলার ইতিহাসের সবচেয়ে গৌরবময় যুগ। এই সময়কালের ভেতর **পালবংশ** (আনুঃ ৭৫০-১১২৫) এবং **সেনবংশ** (আনুঃ ১১২৫-১২৩০) বাংলায় আধিপত্য

করে। এই পাঁচশো বছরের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক বিকাশের মধ্য দিয়েই বাঙালীর ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি চর্চা এবং জাতিসত্তার স্বতন্ত্র ও সুনির্দিষ্ট রূপ গড়ে ওঠে।

পাল ও সেনযুগে বাঙালীদের জীবনযাত্রার নানা পরিচয় আমরা সমকালীন সাহিত্য থেকে জানতে পারি। এই সময় পাল ও সেনযুগের বাঙালীদের ভেতর জাতিভেদ প্রথা ক্রমশঃ বৃদ্ধি

দেখা যায়। প্রধানতঃ কর্মভিত্তিতে এই বিভাগ গড়ে উঠলেও ক্রমে এই বিভাগ বংশগত হয়ে পড়ে। পালযুগে জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা কম থাকলেও সেনযুগে তা বেড়ে যায়।

ব্রাহ্মণদের মধ্যে উঁচু-নীচ বিভাগও এ সময় থেকেই শুরু হয় এবং
করণ বা কায়স্থদের মধ্যেও তা ছড়িয়ে পড়ে।

সে যুগের বাঙালীর জীবনযাত্রার পরিচয় তখনকার নানা
লেখকদের রচনায়, বিশেষ করে সন্ধ্যাকর নন্দী, ধোয়ী, কলহন,
বাৎসায়ন প্রভৃতির গ্রন্থে, চর্যাপদের সূত্রগুলোতে পাওয়া যায়।
হয়েন সাং এবং ইংসিং-এর রচনা থেকেও এগুলো সমর্থিত হয়।

বাঙালীরা ভারতের নানাস্থানে, এমন কি সুদূর
বনযাত্রা

কাশ্মীরে পর্যন্ত বিদ্যাশিক্ষা করতে যেত। স্ত্রী-
লোকেরা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতো, তাদের ভেতর বিদ্যাচর্চার
বেশ প্রচলন ছিল, কিন্তু স্ত্রীলোকদের সামাজিক স্বাধীনতা বিশেষ
ছিল না। সে যুগের বাঙালীর প্রধান খাদ্য ছিল ভাত, মাছ,
মাংস, ফল, শাকসব্জি, দুধ এবং দুগ্ধজাত নানা জিনিস। বাঙালী
ব্রাহ্মণদেরও মাছ-মাংস খাবার নিষেধ ছিল না। সাধারণ

বাঙালীদের মধ্যে শুকনো মাছ খাওয়ার রীতিও
খাদ্যাভ্যাস
প্রচলিত ছিল। হরিণের ও ছাগের মাংস সবচেয়ে
জনপ্রিয় ছিল।

সে যুগের বাঙালীর প্রধান পোশাক ছিল ধুতি ও শাড়ী।
পুরুষেরা শরীরে উপরের অংশ ঢাকবার জন্য উত্তরীয় ব্যবহার করতো
আর মেয়েরা ব্যবহার করতো ওড়না। আংটি, নানা রকম কানের,
হাতের ও গলার গহনা ব্যবহারের রীতিও ছিল।

পোশাক ও
অলংকার

স্ত্রী-পুরুষ সবাই এসব অলংকার ব্যবহার করতো।
মেয়েদের বিশেষ অলংকার ছিল শঙ্খের বলয় বা
শাঁখা। সে যুগের বাঙালীর পোশাক-পরিচ্ছদ-অলংকারের ধরন
এবং তা পরবার পদ্ধতির পরিচয় পাহাড়পুরের মূর্তিগুলো থেকে
পাওয়া যায়।

পালযুগের বাংলায় ব্যবসা-বাণিজ্যের খুব উন্নতি হয়েছিল।
বঙ্গদেশ থেকে মুসল্ল সূতীবস্ত্র, চিনি, মসলা, শঙ্খের অলংকার, পিতল-
কাঁসার বাসন, লোহার অস্ত্রশস্ত্র, মুক্তা, সোনার অলংকার প্রভৃতি

স্থলপথে এবং জলপথে বিদেশে রপ্তানি হত। স্থলপথে চীন ও
ব্যবসা-বাণিজ্য তিব্বতে আর জলপথে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়
উপনিবেশ, সিংহল প্রভৃতি দেশে বাংলার পণ্য
রপ্তানি হত। এর ফলেই পালযুগে তাম্রলিপ্ত এবং সপ্তগ্রাম বন্দর
হিসেবে প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠে।

আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব এক হাজার বছর আগে বঙ্গদেশে আর্যসভ্যতা
ও বৈদিক ধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। অশোকের রাজত্বকালেই
সম্ভবতঃ বৌদ্ধ এবং জৈনধর্মেরও অনুপ্রবেশ ঘটে বঙ্গদেশে। ক্রমে
বৈদিক আর্যধর্ম হিন্দুধর্মে রূপান্তরিত হয়ে যায় এবং
ধর্ম

পালযুগের আগেই বঙ্গদেশে ভাগবত বৈষ্ণবধর্ম ও
শৈবধর্ম প্রবর্তিত হয়। এর সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদেশের প্রায় সর্বত্রই
যে বৌদ্ধধর্ম ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল তা আমরা ফা-
হিয়েন, হুয়েন সাং, ইংসিং প্রভৃতির ভ্রমণ-বৃত্তান্ত থেকে জানতে
পারি। সেনযুগে ভাগবত বৈষ্ণবধর্ম ও শৈবধর্মের প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়,
সঙ্গে সঙ্গে তান্ত্রিক শক্তি সাধনার বা শাক্ত ধর্মমতেরও বিকাশ
ঘটে।

পাল ও সেনযুগের জ্ঞানসাধনার পরিচয় অমর হয়ে আছে সে-
যুগের সাহিত্য ও দর্শন-বিজ্ঞান চর্চায়, বিদ্যাচর্চার জন্য তৈরি
শিক্ষাকেন্দ্রের ভেতর। এ যুগেই আবির্ভূত হন নাট্যকার বিশাখদত্ত,
কবি সঙ্ক্যাকর বন্দী, জয়দেব, ধোয়ী, গোবর্ধনচন্দ্র। বৌদ্ধ ও
হিন্দু দার্শনিক শান্তিরক্ষিত, হরিশ্চন্দ্র, কেশবামিশ্র, গোড়পাদ প্রভৃতি

এ যুগেই জন্মেছেন। এ যুগেই বিখ্যাত আয়ুর্বেদ
জ্ঞান-বিজ্ঞান পণ্ডিত, সর্বভারতীয় খ্যাতিসম্পন্ন চিকিৎসক
সাধনা

চক্রপাণি দত্ত চরক ও শুক্রসূত্রের রচিত আয়ুর্বেদ
শাস্ত্রের টীকা রচনা করেন। এই যুগেই বাংলা ভাষার জন্ম দেন
বিখ্যাত বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য লুইপাদ, নরোরুহ, কুকুরীপাদ, কল্লীপাদ
চর্যাপদ রচনা করে। পালযুগে বাংলায় অসংখ্য শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে
উঠেছিল বৌদ্ধধর্মশাস্ত্র আর জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার জন্য। এর ভেতর

সবচেয়ে বিখ্যাত **উদুপুরী বিহার, বিক্রমশীলা বিহার, সোমপুরী বিহার**। পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপালদেবের উৎসাহে ও দানে নালন্দার কাছে উদুপুরী বিহার নির্মিত হয়। বর্তমান ভাগলপুরের কাছে পাথরঘাটা অঞ্চলে ধর্মপালদেব বিক্রমশীলা বিহার নির্মাণ করান। এই বিহারের খ্যাতি ক্রমে ভারতের বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে। এখানে ১১৪ জন অধ্যাপক ছিলেন। তিব্বত থেকে বহু ছাত্র এখানে পড়তে আসতো। এই বিহারের অধ্যক্ষ ছিলেন সে যুগের এক বিখ্যাত পণ্ডিত **অতীশ**। ইতিহাসে তিনি **দীপঙ্কর ত্রীজ্ঞান** নামেও বিখ্যাত। ধর্মপালদেবের আর এক অবিস্মরণীয় কীর্তি সোমপুরী বিহার। বর্তমান দিনাজপুর জেলার পাহাড়পুর নামক এক জায়গায় মাটি খুঁড়ে এর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। এই বিহারের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য বিস্ময়কর। এ ছাড়াও চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, পূর্ববঙ্গ প্রভৃতি স্থানেও নানা শিক্ষাকেন্দ্র নির্মিত হয়েছিল পালযুগে। **সেনযুগে নবদ্বীপ** জ্ঞানসাধনার তীর্থক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল। বাংলার সাংস্কৃতিক বিকাশে এইজগুই পাল-সেনযুগ বিখ্যাত হয়ে আছে।

মধ্যযুগীয় ভারতে, অর্থাৎ ষষ্ঠ শতাব্দীতে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর দক্ষিণ ভারতে তিনটি প্রধান **পৌত্তলিক** রাজবংশের উদ্ভব হয়। এই বংশ তিনটির নাম **বাদামীর চালুক্যবংশ, কাঞ্চীপুরম্-এর পল্লব বংশ** আর **মাল্লুরাই-এর পাণ্ড্যবংশ**। ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে

তিনশো বছর ধরে এই রাজ্যগুলো ক্রমাগত দক্ষিণ ভারতের **নিজেদের মধ্যে লড়াই চালিয়ে গিয়েছে** সমগ্র দক্ষিণ ভারতে একক প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টায়।

সাতবাহন রাজবংশ ধ্বংস করে বাকাটক বংশ যে অঞ্চলে নিজেদের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল, বাকাটক বংশকে ধ্বংস করে চালুক্য বংশ এ অঞ্চলে নতুন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। উত্তর মহীশূরের **বাতাপী** বা **বাদামী** নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করে এর সংলগ্ন আইহোল এবং তার উত্তর দিকে অবস্থিত নাসিক ও উত্তর গোদাবরী অঞ্চল জুড়ে এই রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

সাতবাহন রাজ্যের দক্ষিণ অংশ আর চালুক্য রাজ্যের দক্ষিণে অবস্থিত কদম্ব রাজ্য অধিকার করে পল্লব বংশীয়েরা নূতন রাজ্য গড়ে তোলে।

খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে পল্লব বংশীয় রাজা **বিষ্ণুগোপ** বাকার্টিক রাজ্যের দক্ষিণে রাজত্ব করতেন। তাঁর রাজধানী ছিল **কাঞ্চী বা কাঞ্চীপুরম**। ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে পল্লবরাজ **সিংহবিষ্ণু** চোলরাজ্য অধিকার করেন এবং তাঁর রাজ্যের দক্ষিণস্থ সমস্ত রাজাদের পরাজিত করে এক বৃহৎ রাজ্য গড়ে তোলেন। তিনি অথবা তাঁর

পৌত্র **নরসিংহবর্মণ** সিংহল (শ্রীলঙ্কা) জয় করে দক্ষিণ ভারত : নিজ রাজ্যসীমা আরও বর্ধিত করেন। সিংহবিষ্ণুর পল্লব বংশ

পুত্র **প্রথম মহেন্দ্রবর্মণের** রাজত্বকালেই বাতাপীর চালুক্যদের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং এই যুদ্ধ কয়েক পুরুষ ধরে চলে। চালুক্যরাজ **দ্বিতীয় পুলকেশী** পল্লব রাজ্যের শক্তি খর্ব করেন। শেষ পর্যন্ত নবম শতাব্দীর শেষভাগে চোলরাজ আদিত্য চোল পল্লবরাজ **অপরাজিতকে** পরাজিত করে পল্লবরাজ্যের শেষ চিহ্ন মুছে দেন।

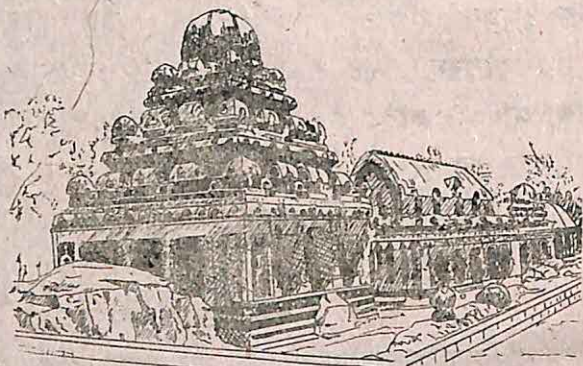
পল্লবদের চিরশত্রু চালুক্যবংশীয়েরা ষষ্ঠ শতাব্দীতে কুর্ণাটক এবং কানাড়ী-ভাষী অঞ্চলে শক্তিশালী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। এই রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠাতা **প্রথম পুলকেশী**। তিনিই বাতাপী নগরে রাজধানী

স্থাপন করেন এবং রাজ্যাভিষেক উৎসব উপলক্ষে চালুক্য বংশ অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। তাঁর পুত্র **প্রথম**

কীর্ত্তিবর্মণ এবং **মল্লেশ** কোঙ্কণের মোর্যরাজ্য, বৈজয়ন্তীর কদম্বরাজ্য, এবং উত্তর মহারাষ্ট্র ও মালবের কলচুরি রাজ্য অধিকার করে নিজ রাজ্যসীমা বৃদ্ধি করেন। তাঁর পুত্র **দ্বিতীয় পুলকেশী** চালুক্য বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। তিনি ৬০৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৬৪২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন এবং সমগ্র মহারাষ্ট্র ও দাক্ষিণাত্যের নর্মদাতীর থেকে কাবেরী তীর পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চল অধিকার করে রাজ্যসীমা সুবিস্তৃত করেন। **আনুমানিক ৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে দন্তিদূর্গ** নামে এক রাজা দ্বিতীয়

বিক্রমাদিত্যের পুত্রকে পরাজিত করে চালুক্য রাজ্যের অবসান ঘটান ও রাষ্ট্রকূট রাজ্যের ভিত্তি রচনা করেন।

পল্লব ও চালুক্য বংশের শাসনকালে দক্ষিণ ভারতে আর্য সংস্কৃতি-
ধারার সঙ্গে দ্রাবিড় শিল্প-সংস্কৃতিধারার মিশ্রণে এক নূতন স্থাপত্য



মহাবল্লীপুরম-এর 'রথ'

রীতির উদ্ভব হয়েছিল। এই রীতির সার্থক পরিচয় মেলে মহাবল্লী-
পুরম-এর অপূর্ব মন্দিরগুলোর মধ্যে—যেগুলোকে তামিল ভাষায় রথ
বলা হয়। চীনা পর্যটক হুয়েন সাং এই মন্দিরগুলো
পল্লব যুগের শিল্প-
সাহিত্য দেখে মুগ্ধ হন। পল্লবরাজ মহামল্লের উদ্যোগেই
এই মন্দিরগুলো তৈরি হয়। পল্লবরাজার সাহিত্য
ও কাব্যের পৃষ্ঠাপোষকও ছিলেন।

চালুক্য শাসকেরাও শিল্প-স্থাপত্যের পৃষ্ঠাপোষক ছিলেন। ইলোরার
কৈলাসনাথ মন্দির চালুক্যবংশীয় রাজাদের এক অবিস্মরণীয় কীর্তি।

বিরটি আকাবের ছোটখাটো পাহাড়ের মতো বড়ো
চালুক্য যুগের
ভাস্কর্য একখানা কালো পাথর কেটে আর খোদাই করে
এই মন্দিরটি তৈরি হয়। অজন্তার বিশ্ববিখ্যাত
গুহাচিত্রের অন্ততম পৃষ্ঠাপোষক ছিলেন চালুক্যবংশের রাজারা।

দশম শতাব্দীর গোড়ার দিকে চোলরাজ্যের অভ্যুদয়। তার
পর থেকে প্রায় চারশো বছর ধরে চোলবংশই দক্ষিণ ভারতের
তামলভাষী অঞ্চলে প্রধান শক্তি হিসেবে আধিপত্য করে। ৯৮৫

ঐষ্টান্বে চোলরাজ প্রথম রাজরাজ চোলরাজ্যের শক্তিবৃদ্ধি করেন এবং পল্লবরাজবংশকে পরাজিত করে কাঞ্চী অধিকার চোল বংশ করে সেখানে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। এর পর থেকে চোলরাজ্যের অবসান পর্যন্ত কাঞ্চীই চোলবংশের রাজধানী ছিল। প্রথম রাজরাজ নিজের রাজ্যসীমা এবং সামরিক শক্তি



ইলোরা কৈলাস মন্দির

বাড়াবার উদ্দেশ্যে কেরল, সিংহল এবং পান্ড্যরাজ্যের জোটের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেন এবং কেরল রাজ্যের অন্তর্গত মালাবার অঞ্চল কেড়ে নেন। এরপর তিনি সিংহলের রাজাকে হারিয়ে সিংহলের রাজধানী অনুরাধাপুর ধ্বংস করেন এবং সিংহলে নিজ প্রাধাত্য প্রতিষ্ঠা করেন।

১০১৪ ঐষ্টান্বে তাঁর ছেলে রাজেন্দ্র চোল সিংহাসনে আরোহণ করে পূর্বদিকে এক বিজয় অভিযান পরিচালনা করেন এবং ওড়িশার ভেতর দিয়ে বঙ্গদেশের গঙ্গাতীর পর্যন্ত পৌঁছান। এরপর তিনি তাঁর নৌশক্তি বৃদ্ধি করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার চম্পা, কম্বুজ, সুবর্ণভূমি, যবদ্বীপ প্রভৃতি অঞ্চলের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন ও দক্ষিণ মালয়

উপদ্বীপ এবং সুমাত্রা নিয়ে গঠিত শ্রীবিজয় রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে ওই অঞ্চলের নানা গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রতীরবর্তী স্থান অধিকার করে বঙ্গোপসাগরের ওপর আধিপত্য স্থাপন করেন। এর ফলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই অঞ্চল নৌবাহিনী ও নৌজিক অভিযান এবং চীনের সঙ্গে দক্ষিণ-ভারতের বাণিজ্য-পথ নিরাপদ হয় এবং চোল রাজ্যের আর্থিক সমৃদ্ধি বাড়তে থাকে। পরবর্তী চোল রাজা **প্রথম কুলোত্তমের** সময়েও (১০৭০-১১১৮) এই অঞ্চলে চোল প্রাধান্য বজায় ছিল। ক্রমে চোল বংশের রাজারা হীনবল হয়ে পড়েন এবং ছুশো বছরের ভেতর চোল রাজ্য লোপ পেয়ে যায়।

অনুশীলনী

(১) রাজপুত কাদের বলা হয়? রাজপুত জাতির আবির্ভাব ও উত্তর ভারতে তাদের আধিপত্য স্থাপনের বিবরণ সংক্ষেপে লিখ।

(২) উত্তর ভারতে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য অষ্টম-নবম শতাব্দীতে পাণ্ডু-গুর্জর-রাষ্ট্রকূট সংঘর্ষের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

(৩) বঙ্গদেশের প্রথম শক্তিশালী রাজা কে ছিলেন? গৌড়বঙ্গের অধিপতি হিসেবে তাঁর কৃতিত্ব বিচার কর।

(৪) পাল ও সেনযুগ কাকে বলে? এই যুগের বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি জীবনের পরিচয় সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

(৫) দক্ষিণ ভারতে ষষ্ঠ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিভিন্ন রাজবংশের ভেতর সংঘাত-সংঘর্ষের পরিচয় দাও। এদের মধ্যে কোন বংশের রাজারা এক বড় নৌশক্তি হয়ে উঠেছিলেন? এই বংশের বিদেশ জয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখ।

(৬) দক্ষিণ ভারতীয় রাজাদের শিল্পশ্রীতির পরিচয় দিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত রচনা লেখ।

(৭) টীকা লেখ:—(ক) রাজেন্দ্র চোল, (খ) বিজয়নগর বিহার, (গ) পালযুগের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা, (ঘ) পাল ও সেনযুগের ধর্ম, (ঙ) পাল যুগের বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা।

ভারতের বৈদেশিক উপনিবেশ

[সংক্ষিপ্তসার :—প্রাচীন কাল থেকেই ভারতের সঙ্গে সংলগ্ন দেশগুলির সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক যোগাযোগ গড়ে উঠতে থাকে। অশোকের রাজত্বকালে ভারতের বাইরে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের উত্থাপ নেওয়া হয়। কনিষ্কের শাসনকালে মধ্য এশিয়ায় দেশীয় বাণিজ্যপথের ওপর অবস্থিত মধ্য এশিয়ায় প্রধান প্রধান অনেক শহরে ভারতীয় বৌদ্ধ মঠ ও বণিকদের উপনিবেশ গড়ে ওঠে, বাহ্লীক দেশে ভারতীয় সংস্কৃতির বিস্তার হয়। এরপর এ অঞ্চল থেকে চীনে বৌদ্ধধর্মের অল্পপ্রবেশ ঘটে। মধ্যযুগে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মালয়, ইন্দোচীন ও ইন্দোনেশিয়ায় ভারতীয় উপনিবেশ গড়ে ওঠে। সিংহলে ভারতীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐসবের সঙ্গেও এই সময় ভারতের ঘনিষ্ঠ সাংস্কৃতিক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।]

অতি প্রাচীনকালেই যে ভারতীয় সভ্যতার সঙ্গে পশ্চিম এশিয়া ও মিশরের নদীমাতৃক সভ্যতাগুলোর সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তার পরিচয় আমরা মেসোপটেমিয়া ও মিশরের প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার থেকে জানতে পেরেছি। অজ্ঞাতনামা গ্রীক নাবিকের রচনা 'দি পেরিপ্লাস অব দি ইরিথ্রিয়ান সি' থেকে জানা যায় যে, খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে ভারতের সঙ্গে ইউরোপের ঘনিষ্ঠ বাণিজ্য-সম্পর্ক ছিল। আরব সাগরের সোকোত্রা দ্বীপে ভারতীয় বাণিকদের উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল। অশোকের রাজত্বকালে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা ধর্মপ্রচারের জন্য পশ্চিম এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা এবং দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে প্রেরিত হয়েছিল। মধ্য এশিয়ায় ভারতীয়

সংস্কৃতির পূর্ণ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় কুষাণ রাজত্ব-
 ভারতের বৈদেশিক উপনিবেশ :
 মধ্য এশিয়া

কালে। বর্তমান কালে যে শহরটি খোটান নামে পরিচিত, তার আশেপাশে সে সময় বহু ভারতীয় উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল। এখন যাকে তাকলা-মাকান মরুভূমি বলা হয়, সেই অঞ্চলে এক সময় বহু ভারতীয়

উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই মরুভূমি অঞ্চল থেকে বিখ্যাত **প্রত্নতাত্ত্বিক স্ত্রার অরেল স্টন** এবং আরও নানা পণ্ডিত বহু বৌদ্ধ স্তূপ ও মঠের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেছেন, খুঁজে পেয়েছেন অনেক বৌদ্ধমূর্তি ও হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি, ভারতীয় ভাষায়, ভারতীয় লিপিতে লেখা নানা পাণ্ডুলিপি। সাম্প্রতিক কালে সোভিয়েত দেশের প্রত্নতাত্ত্বিকেরা **কাশপড় ও সমরকন্দে** সন্ধান চালিয়ে বেশ বড় বড় ভারতীয় উপনিবেশের সন্ধান পেয়েছেন। এই সব আবিষ্কার থেকে

অরেলস্টন ও
হুয়েন সাং-এর
অভিমত

প্রমাণিত হয়েছে যে, এই সব অঞ্চলে ভারতীয় উপনিবেশ, ভারতীয় ধর্ম-সংস্কৃতির প্রভাব সম্ভবতঃ **খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী** পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল।

খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে হুয়েন সাং যখন মধ্য

এশিয়ার ভেতর দিয়ে ভারতে এসেছিলেন এবং ভারত থেকে স্বদেশে ফিরেছিলেন তখন তিনি এই অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম ও ভারতীয় সংস্কৃতির প্রবল প্রভাব দেখতে পান বলে মন্তব্য করেছেন।

মধ্য এশিয়া থেকেই চীনে বৌদ্ধধর্ম প্রসারিত হয়েছিল। কুশাণ সম্রাট মহাযানী বৌদ্ধ ছিলেন বলে তাঁদের শাসনাধীন এ অঞ্চলে মহাযান বৌদ্ধধর্মই প্রাধান্য লাভ করেছিল। তাই চীনেও মহাযান

বৌদ্ধমতই প্রচারিত হয়। বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে সঙ্গে চীনে বৌদ্ধধর্ম ও প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতিও চীনের সভ্যতা-ভারতীয় সংস্কৃতির ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল।

দলে দলে চীনা সন্ন্যাসী দীর্ঘ, বিপদসংকুল পথ পাড়ি দিয়ে ভারতে এসেছেন ভারত থেকে বৌদ্ধধর্মের মতাদর্শ ও রীতিনীতির প্রামাণ্য জ্ঞান লাভ করতে,—নিয়ে গিয়েছেন হাজার হাজার বৌদ্ধ ধর্মপুস্তক, সেগুলো অনুবাদ করেছেন চীনা ভাষায়। শতশত ভারতীয় পণ্ডিতকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে চীনে, পবিত্র বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের অনুবাদকর্মে সাহায্য করবার জন্ত। তাঁরা শেষ পর্যন্ত চীনের অধিবাসী হয়ে গিয়েছেন। চীন থেকেই বৌদ্ধধর্ম কোরিয়া ও জাপানে প্রসারিত হয়। কোরিয়া থেকেও জ্ঞানপিপাসু

বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা এসেছিলেন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞান অর্জন করতে, বৌদ্ধ ধর্মদর্শনের মূল শাস্ত্রকে জানতে।

মধ্য এশিয়ার অন্তর্গত ভারতের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত সংলগ্ন অঞ্চলের ঠিক পূর্বে রয়েছে তিব্বত। তিব্বতের দক্ষিণে রয়েছে ভারত। মধ্যযুগে তিব্বতের মধ্য দিয়ে চীন থেকে নেপালের মধ্যে একটি বাণিজ্য-পথ ছিল এবং এই বাণিজ্য-পথে ভারত-চীন বাণিজ্য চলতো।

খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে তিব্বতের ইতিহাস-বিখ্যাত রাজা স্রংৎসান গাম্পো সে দেশে বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তন করেন। তিব্বত থেকেও বৌদ্ধ

তিব্বত সন্ন্যাসীরা দলে দলে ভারতে এসেছেন বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রের জ্ঞান অর্জনের জন্য। বাংলার পাল রাজারা তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের সংস্কারের জন্য নানাভাবে সহায়তা করেন। তিব্বতী সন্ন্যাসীরা নালন্দা ও বিক্রমশীলায় বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করতেন। শান্তিরক্ষিত, চন্দ্রগোমিন, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান প্রভৃতি বহু ভারতীয় বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা দেবার জন্য তিব্বতে গিয়েছেন। তাঁদের ভেতর সবচেয়ে বিখ্যাত হলেন বিক্রমশীলা বিহারের অধ্যক্ষ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। তিব্বতীরা এখনও তাঁর নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে থাকে।

৯৮০ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশের বিক্রমণিপুর্বে (ঢাকা জেলার বিক্রমপুর গ্রাম) গোড়ের রাজপরিবারে দীপঙ্করের জন্ম হয়। তাঁর বাবার নাম ছিল কল্যাণশ্রী আর মায়ের নাম প্রভাবতী। ছেলেবেলায় তাঁর নাম ছিল চন্দ্রগর্ভ। তিনি অল্পবয়সে বিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত জেতারির

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান কাছে শিক্ষালাভ করেন। পরে তিনি কৃষ্ণগিরি **অতীথ** বিহারে লেখাপড়া করেন। এই স্থানটি এখন

কাহ্নেরী নামে পরিচিত এবং বোম্বাই রাজ্যের অন্তর্গত। এখানকার পাঠ সাদ্ধ করে তিনি ওদন্তপুরী বিহারে আসেন। উনিশ বছর বয়সে তিনি আচার্য শীলরক্ষিতের কাছে সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। আচার্য শীলরক্ষিতই তাঁর নামকরণ করেন দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। পরবর্তিকালে তিব্বতীরা তাঁর নাম দেয়

অতীশ। ৩১ বছর বয়সে তিনি 'ভিক্ষু', অর্থাৎ ধর্মপ্রচারক সম্মানস্বরূপে অভিষিক্ত হন এবং বৌদ্ধশাস্ত্র সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞানলাভের জন্য সুবর্ণদ্বীপে (সুমাত্রা) চলে যান। বারো বছর সেখানে শিক্ষালাভ করে তিনি মগধে আসেন। রাজা মহীপাল তাঁকে বিক্রমশীলা মহাবিহারের অধ্যাপনায় নিযুক্ত করেন। মহীপালের পুত্র নম্বুপাল বাংলার রাজা হয়ে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানকে বিক্রমশীলা মহাবিহারের অধ্যক্ষ পদে প্রতিষ্ঠিত করেন।

একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দীপঙ্কর তিব্বতে যাত্রা করেন। ১৩ বছর ধরে তিনি তিব্বতে বাস করে সেখানকার বৌদ্ধধর্মের নানা গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার সাধন করেন এবং আনুমানিক ১০৫৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রায় ৭৩ বছর বয়সে তিব্বতে মারা যান। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন এবং এর মধ্যে অনেকগুলো হল বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রের তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ।

বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ এবং টলেমির ভূবৃত্তান্ত থেকে জানা যায় যে, খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে ভারতের দক্ষিণ-পূর্বে ভারত মহাসাগরে অবস্থিত দ্বীপময় অঞ্চল এবং মালয় উপদ্বীপের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য-সম্পর্ক দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় গড়ে উঠেছিল। বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতে যবদ্বীপ, সুমাত্রা

ও মালয় উপদ্বীপের নানা বন্দর ও বাণিজ্যকেন্দ্রের নাম দেখতে পাওয়া যায়। এই নামগুলো সব সংস্কৃতভাষার শব্দ। বৌদ্ধজাতক এবং কথাসরিৎসাগরে ভারতীয় বণিকদের সুবর্ণভূমিতে বাণিজ্য করতে যাবার বর্ণনা আছে। দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম শতাব্দীর ভেতর মালয় উপদ্বীপ, কাম্বোডিয়া, আনাম (বর্তমান ভিয়েতনাম), প্রভৃতি অঞ্চলে এবং সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বালি, বোর্নিও প্রভৃতি দ্বীপে ভারতীয়রা রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল। এইসব রাজ্যের ইতিহাস এসব অঞ্চলে পাওয়া সংস্কৃত শিলালিপি থেকে এবং চীনা ভ্রমণকারীদের বিবরণ থেকে জানা গিয়েছে। এসব অঞ্চলে প্রথম শৈবধর্ম প্রবর্তিত হয়, পরে বৌদ্ধধর্ম এসব রাজ্যের কতকগুলোতে বিস্তারলাভ করে। প্রায় এক হাজার বছর ধরে এসব অঞ্চলের সমাজ ব্যবস্থায় ভারতীয় সভ্যতার মূল বৈশিষ্ট্যগুলো অবিকৃত ছিল।

ইন্দোচীনের মূল ভূখণ্ডে দুটি শক্তিশালী ভারতীয় রাজ্য গড়ে ওঠে, এই দুটি হল চম্পা আর কাম্বোজ। চম্পারাজ্যের সীমা আধুনিক ভিয়েতনামের প্রায় সমগ্র অঞ্চলে বিস্তৃত ছিল। এই রাজ্যের কয়েকজন প্রধান প্রধান রাজা ছিলেন জয়পরমেশ্বরদেব ঈশ্বরমূর্তি, রুদ্রবর্মণ, হরিবর্মণ, মহারাজাধিরাজ, শ্রীজয় ইন্দ্রবর্মণ, চম্পা

জয়সিংহবর্মণ প্রভৃতি। এই সব রাজারা বড় বড় বীর ছিলেন। খ্রীষ্টাব্দ ১৫০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৪৭১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই রাজ্য নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। এই রাজ্যের প্রতিবেশী আন্নামীদের এবং মোঙ্গল যাযাবরদের বার বার আক্রমণের ফলে তেরো শো বছর পর এই রাজ্যের পতন ঘটে। চম্পারাজ্যে অনেক মুক্ত নগর গড়ে উঠেছিল, সমস্ত দেশেই সুন্দর সুন্দর হিন্দু এবং বৌদ্ধ মন্দির ছিল।

কাম্বোজের ভারতীয় রাজ্যের উদ্ভব কি করে হয়েছিল তা সঠিক জানা যায় না। একথা মোটামুটি সঠিকভাবে জানা গিয়েছে যে,

খ্রীষ্টীয় প্রথম অথবা দ্বিতীয় শতাব্দীতে প্রথম কাম্বোজ

কাম্বোজের হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমান কাম্বোডিয়ায় দক্ষিণ অংশে এই রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং চীনের ইতিহাসে এই রাজ্য ফুনান নামে পরিচিত। ক্রমে এই রাজ্য খুব শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং কয়েকটি রাজ্যকে অধীনতা স্বীকারে বাধ্য করে।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে আন্নামী আর থাই জাতিগোষ্ঠীর ক্রমাগত আক্রমণের ফলে এই রাজ্যের অবসান ঘটে। এই বংশের রাজাদের ভেতর প্রথম, দ্বিতীয় ও সপ্তম জয়বর্মণ, যশোবর্মণ এবং দ্বিতীয় সূর্যবর্মণ সবচেয়ে বিখ্যাত ছিলেন। কাম্বোজ রাজ্য চম্পারাজ্যের চেয়ে অধিক শক্তিশালী ছিল। বর্তমান কাম্বোডিয়া, কোচিন-চীন, লাওস, শাম, ব্রহ্মদেশের কিছু অংশ এবং মালয় উপদ্বীপ প্রভৃতি এই রাজ্যের অধিকারভুক্ত হয়। সংস্কৃত ভাষায় লেখা অনেকগুলো শিলালিপি থেকে আমরা এই রাজ্য ও রাজাদের পরিচয় জানতে

পেরেছি। অঙ্কোরভট ও অঙ্কোরথম-এর অপূর্ব মন্দিরগুলো আজও এই রাজ্যের শিল্পসমৃদ্ধির পরিচয় বহন করে। অঙ্কোরভট ছিল একটি বিরাট বিষ্ণুমন্দির, অসংখ্য গম্বুজশোভিত এই মন্দিরটি



অঙ্কোরভট

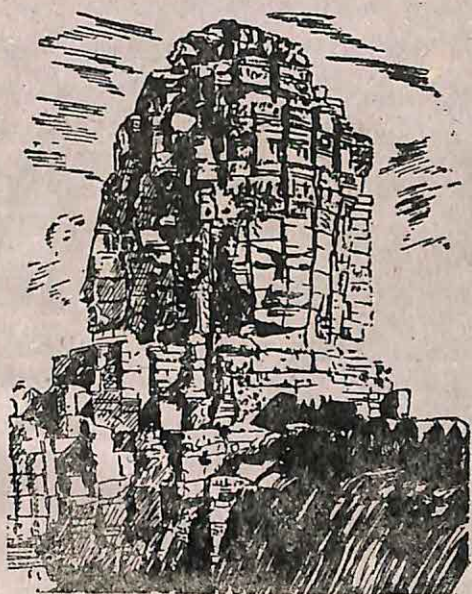
আজও ভারতীয় শিল্পস্থাপত্যের এক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলে বিবেচিত হয়।

কম্বোজরাজ সপ্তম জয়বর্ধনের দ্বারা নির্মিত রাজধানীকে আধুনিক কালে অঙ্কোরথম নামে চিহ্নিত করা হয়। কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন যে ‘অঙ্কোরথম’ কথাটি সংস্কৃত ‘নগরধাম’ শব্দ থেকে এসেছে। বর্গাকৃতি এই নগরের আয়তন চার বর্গমাইলের অধিক। ৩৩০ ফুট চওড়া একটি পরিখা বা খাল এই নগরের বেষ্টিত ছিল। নগরটি উঁচু পাথরের দেওয়াল দিয়ে ঘেরা ছিল। নগরের মাঝখানে ছিল বেয়নের বিরাট মন্দির, পিরামিডের আকারে

তৈরি। এর চত্বশিটি গম্বুজ বা চূড়া ছিল, মাঝখানের

চূড়াটি প্রায় ১৫০ ফুট উঁচু। প্রত্যেক চূড়ায় বৌদ্ধ দেবতা অবলোকিতেশ্বরের চারটি মুখ খোদিত ছিল। বেয়ন মন্দিরের চারদিকে নানা বড় বড় মন্দির ও প্রাসাদ ছিল। নগরের পাঁচটি তোরণ ছিল সুন্দর চূড়াসজ্জিত, প্রত্যেক তোরণের সঙ্গে ছিল বড় বড় প্রহরাগৃহ। প্রত্যেক তোরণ থেকে একশো ফুট চওড়া, একমাইল

দীর্ঘ রাজপথ নগরের কেন্দ্র পর্যন্ত চলে গিয়েছে। নগরের মধ্যে উঁচু পাড়ওয়ালা অনেকগুলো বড় বড় দীঘি ছিল, একটা দীঘিতে ১২০০ ফুট লম্বা এবং ৯৩ ফুট উঁচু পাথর কেটে তৈরি অপূর্ব ভাস্কর্যশোভিত সিঁড়ি দেখতে পাওয়া যায়। সংক্ষেপে বলা যায় যে, অঙ্কোরথম সে যুগের সেরা শহর-গুলোর অগ্রতম ছিল।

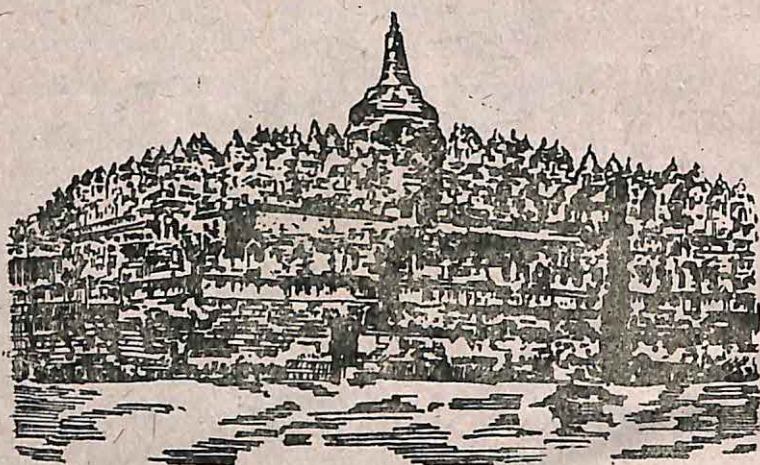


অঙ্কোরথমের মন্দির চূড়া

মালয় উপদ্বীপ এবং পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বালি, বোর্নিও প্রভৃতি প্রধান দ্বীপ নিয়ে খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে শৈলেন্দ্র বংশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁদের এক শক্তিশালী নৌবাহিনী ছিল এবং তাঁরা চম্পা ও কম্বোজ রাজ্যে বার বার অভিযান চালিয়েছিলেন।

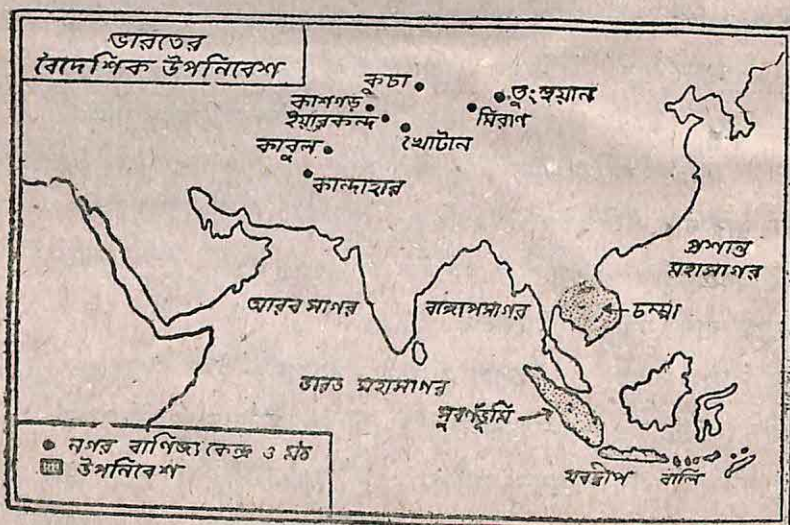
শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজারা মহাযানী বৌদ্ধ ছিলেন। চীন এবং ভারতের রাজাদের সঙ্গে তাঁদের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিল। শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজা বালপুত্রদেব বাংলার অধিপতি সম্রাট দেবপালদেবের কাছে দূত পাঠিয়েছিলেন নালন্দায় তাঁর প্রতিষ্ঠিত মঠের জন্য পাঁচখানা গ্রাম দান করবার অনুরোধ জানিয়ে। শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজারা বহু সুন্দর সুন্দর মন্দির নির্মাণ করিয়েছিলেন। এসব মন্দিরের ভেতর যবদ্বীপের বোরোবুদুর মন্দির সর্বশ্রেষ্ঠ। সমগ্র মন্দিরটি প্রায় আশি হাজার বর্গফুট জায়গা জুড়ে অবস্থিত। এই মন্দিরের স্থাপত্য,

ভাস্কর্য, শিল্পকলার জন্য একে মধ্যযুগের পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য বলা হয়ে থাকে।



বোরোবুদুর মন্দির

খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এক হিন্দু রাজা সেলিবিস দ্বীপে মালাক্কা রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই রাজ্যের



দ্বিতীয় নরপতি ইসলামধর্মে দীক্ষিত হন। ক্রমে অত্যাশ্রয় দ্বীপে ইসলামধর্ম ছড়িয়ে পড়ে। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বিজয়রাজ

বংশীয় হিন্দুরাজা সিংহাসনচ্যুত হলে যবদ্বীপেও ইসলাম ধর্ম সম্প্রসারিত হয়। রাজপরিবার এবং রাজ্যের হিন্দু প্রজাদের হিন্দু সাম্রাজ্যের এক বড় অংশ বালিদ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করে। এই দ্বীপে এখনও হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি বেঁচে আছে, — পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের আর সর্বত্রই মুসলমান ধর্ম আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছে।

অসুশীলতা

(১) ভারতের সঙ্গে পশ্চিম এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা ও দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের যোগাযোগ কখন থেকে শুরু হয়েছিল? এই যোগাযোগের কারণ কি?

(২) মধ্য এশিয়ার সঙ্গে ভারতের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ কখন থেকে শুরু হয়? মধ্য এশিয়ার কোথায় কোথায় ভারতীয় উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল? এসব উপনিবেশের বিবরণ আহর্যকিভাবে জানতে পেরেছি?

(৩) চীনে বৌদ্ধধর্ম কবে, কোথা থেকে সম্প্রসারিত হয়? চীন ও তিব্বতের সঙ্গে ভারতের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগের পরিচয় সংক্ষেপে লেখো।

(৪) দীপঙ্কর ত্রিজ্ঞান কে ছিলেন? কেন তাঁকে অতীশ নামেও অভিহিত করা হয়? সংক্ষেপে তাঁর জীবনবৃত্তান্ত লেখ।

(৫) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কোথায় কোথায় এবং কোন্ সময় ভারতীয় উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল? এসব উপনিবেশের বিবরণ কিভাবে জানা গিয়েছে? এসব উপনিবেশগুলো কতদিন স্থায়ী হয়েছিল?

(৬) চম্পা ও কাম্বোজরাজ্য কোথায় অবস্থিত ছিল? এই সব রাজ্যের সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক বিবরণ লেখো।

(৭) শৈলেন্দ্রবংশ কিজ্জত বিখ্যাত? এই বংশের কৃতিত্বের পরিচয় দাও।

(৮) টাকা লেখ:—(ক) স্মার অরেলগীন, (খ) অক্সোরথম, (গ) বোরোবুদুর, (ঘ) অক্সোরভট।

দ্বাদশ অধ্যায়

দিল্লীর মুলতানী শাসন

[লংকিপুসার :- অষ্টম শতাব্দীতে আরবীয়েরা প্রথম ভারতে প্রবেশ করে। কিন্তু তিনশো বছর চেষ্টা করেও তারা সিন্ধু আর মুলতান ছাড়া ভারতের আর কোন অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করতে পারে নি। একাদশ শতাব্দীতে গজনবীর তুর্কী মুলতান মাহমুদ বাব বার ভারত লুণ্ঠন করেন। তিনি অবশ্য সমগ্র ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করেন নি, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ভারতের প্রবেশদ্বার পাঞ্জাব অধিকার করেই তিনি সন্তুষ্ট থাকেন। প্রায় দু'শো বছর পর এই পথেই 'ঘুর'-এর মুহম্মদ ভারতে প্রবেশ করেন এবং দিল্লী অধিকার করে প্রথমে তুর্কী শাসনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন ভারতের মাটিতে। ক্রমে এই সাম্রাজ্য শক্তি সঞ্চয় করে ভারত-জোড়া সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে এবং দিল্লীকে কেন্দ্র করে তুর্ক-আফগান স্থানতামরা ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্যন্ত ভারত শাসন করেন। এর ফলে ভারতে ইসলাম ধর্ম ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং ভারতীয় ধর্ম-সংস্কৃতি শিল্পধারার সঙ্গে ইসলামী ধর্ম-সংস্কৃতি-শিল্পধারার মিলনে ভারতের সমাজ-জীবনে নতুন ধর্মচেতনা, নতুন শিল্পসংস্কৃতির বিকাশ ঘটে। ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির বিকাশধারার দিল্লীর মুলতানী শাসনের এটাই প্রধান অবদান।]

ইসলাম ধর্মাবলম্বী আরবেরা অষ্টম শতাব্দীর প্রথম দশকে ভারতের পশ্চিম সীমান্তবর্তী সিন্ধুদেশে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু পরবর্তী তিনশো বছরের ভেতর আরবেরা একমাত্র মুলতান ছাড়া অন্য কোন অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করতে পারে নি। গুর্জর প্রতিহার বংশের রাজারা আরবদের অগ্রগতির চেষ্টা সাফল্যের সঙ্গে প্রতিরোধ করেন। আরব খলিফাদের শক্তি হ্রাস পাওয়ার ফলে সিন্ধুর আরব অধিকার ছোটো স্বাধীন রাজ্যে ভাগ হয়ে যায় এবং তখনকার ভারতের পরাক্রান্ত রাজপুত রাজাদের বিরুদ্ধে সফল অভিযানের শক্তি হারিয়ে ফেলে।

তুর্করাই প্রকৃতপক্ষে ভারতে ইসলামের প্রতিষ্ঠায় সফল হয় তুর্ক-আফগান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ভেতর দিয়ে।

১১৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ঘুর-এর সুলতান গিয়াসউদ্দিন মুহম্মদ গজনী
অধিকার করে তার ছোটভাই মুইজউদ্দিন মুহম্মদ-বিন-সামকে
গজনীর শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। ইনিই
ভারতের তুর্কী ইতিহাসে মুহম্মদ ঘুরী নামে পরিচিত। মুহম্মদ
শাসন : ঘুরের ঘুরী প্রথম ভারত অভিযান করেন ১১৭৫ খ্রীষ্টাব্দে।
মুহম্মদ ১১৯২ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর রাজপুত রাজা পৃথ্বীরাজকে
পরাজিত ও নিহত করে মুহম্মদ ঘুরী দিল্লী অধিকার করেন। ফলে
ভারতে তুর্কী শাসনের সূত্রপাত হয়।

১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে মুহম্মদ ঘুরী অজ্ঞাত আততায়ীর হাতে নিহত
হলে তাঁর রাজ্য তাঁর অধীন প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের অধীন হয়।
ভারতের তুর্কী এই ভাবেই ভারতের তুর্কী রাজ্যের সুলতান হন
শাসন : দাসবংশ আলবারী তুর্কী বংশীয় কুতুবুদ্দীন আইবক্। এই
বংশের প্রতিষ্ঠাতা কুতুবুদ্দীন একসময় ক্রীতদাস
ছিলেন বলে ইতিহাসে এই বংশ দাস বংশ নামে পরিচিত।

জালালউদ্দীন খল্জি সম্ভবতঃ আফগান ছিলেন। তাঁর ভাইপো
এবং জা মা তা আলাউদ্দীন
খল্জি তাঁকে হত্যা করে দিল্লীর
সিংহাসনে
খল্জীবংশ বসেন। রণ-
নিপুণ সেনাপতি আলাউদ্দীন
খল্জি সর্বপ্রথম দক্ষিণ ভারত
বিজয়ে সাফল্য লাভ করেন।
পশ্চিম ভারতও তাঁর অধিকার-
ভুক্ত হয়, রাজস্থানের রাজপুত
রাজ্যগুলোও তিনি জয় করেন।
এই ভাবে আলাউদ্দীন খল্জীর
রাজত্বকালেই তুর্ক-আফগান সাম্রাজ্য প্রায় ভারত-জোড়া
বিস্তৃতি লাভ করে।



আলাউদ্দীন খল্জী

তুঘলক বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট মুহম্মদ বিন তুঘলক। তিনি তাঁর পিতা গিয়াসুদ্দিন তুঘলকের মৃত্যুর পর (১৩২৫ খ্রীঃ) সিংহাসনে বসেন।

মুহম্মদ বিন তুঘলক একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত ছিলেন। তিনি তুঘলক বংশ ছিলেন খুব বুদ্ধিমান, প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী মুহম্মদ বিন তুঘলক আর নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। এ ছাড়া তিনি একজন দক্ষ সেনাপতি ছিলেন এবং বহু যুদ্ধে তিনি জয়লাভ করেন।



অসাধারণ দানশীল, সংযমী, মিতাচারী এই সম্রাট তাঁর অদ্ভুত সব খামখেয়ালীর জন্য ইতিহাসে পাগ্লা রাজা নামে চিহ্নিত হয়ে আছেন। শুধু তাই নয়, এইসব খামখেয়ালীর জন্যই তাঁর বিরাট সাম্রাজ্য ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়।

মুহম্মদ বিন তুঘলক তাঁর মৃত্যুর মাত্র ৬২ বছরের ভেতর তুঘলক বংশের পতন ঘটে এবং দিল্লীর সুলতানী সাম্রাজ্য কেবলমাত্র দিল্লী আর তার নিকটবর্তী অল্প কিছু অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। এরপর

সৈয়দ আর লোদীবংশ মাত্র শতাধিক বছর দিল্লীর সুলতানী শাসনের সিংহাসন অধিকার করে থাকে। অবশেষে ১৫২৬ অবসান

খ্রীষ্টাব্দে তৈমুরের উত্তরপুরুষ চাঘতাই তুর্কবংশীয় বীর জহিরুদ্দীন মুহম্মদ বাবর লোদী বংশের শেষ সম্রাট ইব্রাহিম লোদীকে পিঠাধারে প্রথম যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। দিল্লীর সুলতানী শাসনের অবসান হয়।

তিনশো বছরের কিছু বেশী সময় তুর্ক-আফগান সুলতানরা দিল্লীতে রাজত্ব করেছেন এবং ভারত-জোড়া সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্নও দেখেছেন, কিন্তু পূর্বে বাংলা আর আসাম এবং দক্ষিণে দাক্ষিণাত্য

মালভূমির ওপর তুর্ক-আফগান সুলতানের আধিপত্য দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। শুধু তাই নয় একমাত্র দিল্লী, পাঞ্জাব আর গঙ্গা যমুনার



মধ্যবর্তী দোয়াব অঞ্চল ছাড়া আর কোন অঞ্চলকেই দিল্লীর সুলতানেরা বেশিদিন নিজেদের প্রত্যক্ষ অধীনে রাখতে পারেন নি। একজন শক্তিশালী ও রণনিপুণ সুলতানের সফল বিজয় অভিযান পরবর্তী সুলতানের অপদার্থতা ও সামন্ত সর্দারদের রাজ্য-লোভের ফলে ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে। ভারতে-আসা তুর্ক-আফগান

সর্দারেরা ছিলেন ভাগ্য্যবশী। তাই একজন দিল্লীর সিংহাসনে বসলে অন্তেরা তাকে সরাসরে চেষ্টা করেছেন, নয় তো প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক শাসনকর্তা নিযুক্ত হলে সামান্যতম সুযোগেই স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। এই জগ্রেই তুর্ক-আফগান শাসনকালে ভারতে কোন শক্তিশালী সার্বভৌম রাজ্য গড়ে উঠতে পারে নি।

কিন্তু সুলতান আর তাঁর সভাসদদের লোভ আর চক্রান্তের আবহাওয়া থেকে দূরে ভারতের সমাজ-জীবনে এক ব্যাপক পরিবর্তনের ধারা সুলতানী যুগেই প্রবাহিত হতে আরম্ভ করে। এ ধারা হিন্দু-মুসলমান ধর্মসংস্কৃতির সমন্বয়ের ধারা। ভারতীয় এবং সাংস্কৃতিক জীবন ইসলামী স্থাপত্য, চিত্রকলা, সংগীত, ভাষা-সাহিত্যের এক অপূর্ব সমন্বয়ের ফলে সুলতানী যুগের ভারতে এক নূতন সংস্কৃতিধারার সৃষ্টি হয়। হিন্দু দর্শনচিন্তার প্রভাবে একদিকে যেমন ইসলাম ধর্মের দর্শনচিন্তা সুফীবাদের আবির্ভাব হয় অতীতিকে তেমনি ইসলামধর্মের সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ হিন্দুধর্মে উদার ভক্তিবাদের জন্ম দেয়।

সুলতান মুহম্মদের ভারত অভিযানের সময় বিখ্যাত আরবী অনুবাদকর্ম পণ্ডিত **অলবিরুণী** ভারতে আসেন এবং ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের নানা শাস্ত্র আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন। ভারতে তুর্ক-আফগান প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হবার পরেও দেখা যায় যে, কাশ্মীরের সুলতান **জৈন-উল আবেদিনের উৎসাহ** এবং পৃষ্ঠপোষকতায় **মহাভারত ও বহুলনের** রচনা **রাজতরঙ্গিণী** ফার্সী ভাষায় অনূদিত হয়। বাংলার সুলতান **জুসেন শাহের উদ্যোগ** ভাগবতের বঙ্গানুবাদ এবং পরবর্তিকালে তাঁর সেনাপতি **পরাগল খাঁ** ও তাঁর পুত্র **ছুটি খাঁর উৎসাহ** ও পৃষ্ঠপোষকতায় **মহাভারতের বঙ্গানুবাদ** হয়েছিল। ভারতে হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতি সমন্বয়ের ফলেই উচ্চভাষার জন্ম হয় এবং নানা প্রাদেশিক সাহিত্যের উন্নতি হতে আরম্ভ করে।

এই যুগের তৈরি প্রাসাদ, মসজিদ প্রভৃতিতে ভারতীয় এবং ইসলামী শিল্পকলার অপূর্ব মিলন ঘটেছে। ভারতীয় শিল্পস্থাপত্যের

দৃঢ়তা এবং সুখমা ইসলামী শিল্পকলাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে।

শিল্প-স্থাপত্য এই দুই রীতি মিলে মিশে ভারতে এক নূতন শিল্পধারার জন্ম দেয়। দিল্লীর নিজামুদ্দীন আউলিয়ার দরগায় নির্মিত জামায়েতখানা, কুতুবমিনারের অপূর্ব কারুকার্যশোভিত আলাই দরওয়াজা, জৌনপুরের অতালদেবী মসজিদ, গুজরাট ও মালবের মসজিদ, বাংলার গোড়, আদিনা ও পাণ্ডুয়ার বানুদুয়ারী, আদিনা মসজিদ, বড়সোনা মসজিদ প্রভৃতিতে এই মিশ্র শিল্পস্থাপত্যের পরিচয় আজও আমাদের মুগ্ধ ও বিস্মিত করে।

হিন্দুধর্মের ও ইসলাম ধর্মের মানুষরা তুর্ক-আফগান যুগের পরস্পরের কাছাকাছি হয়ে উঠেছিল বলেই হিন্দুধর্মের সংকীর্ণতা আর ইসলাম ধর্মের গোঁড়ামি দূর হয়ে ভক্তিবাদ আর সৃষ্টিবাদের উদার মতাদর্শ

ভারতের মাটিতে জন্মলাভ করে। কয়েকজন উদার ভক্তিবাদ ও সৃষ্টিবাদ ও ধর্মপ্রাণ ভক্তসাধক হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের মধ্যে সমন্বয়সাধনের চেষ্টা করেন। তাঁরা যে ধর্ম প্রচার

করেন তার মূল কথা হল ঈশ্বর এক, আর হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের মূল নীতিও অভিন্ন। সব মানুষ ভগবানের কাছে সমান। ভগবানকে পেতে হলে ভক্তিভরে তাঁকে ডাকতে হবে, আচার-অনুষ্ঠানের দরকার নেই। ভগবানে ভক্তি আর সর্বজীবে ভালবাসা এই ধর্মের মূল কথা। তাই এই ধর্মকে ভক্তিবাদ বলা হয়। ভক্তিবাদ প্রচারকদের ভেতর রামানন্দ, কবীর, শ্রীচৈতন্য ও নানক সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

রামানন্দ চতুর্দশ শতাব্দীতে এলাহাবাদে এক ব্রাহ্মণবংশে জন্মেছিলেন। তিনি রাম-সীতার আরাধনা করতেন। তিনিই সর্বপ্রথম হিন্দীভাষায় ধর্মপ্রচার করেন। তিনি

রামানন্দ জাতিভেদ প্রথার বিরোধী ছিলেন। তাই ভারতের নিম্নবর্ণের হিন্দুরা তাঁর ভক্ত হয়ে ওঠে। তাঁর বারোজন প্রধান শিষ্যের মধ্যে একজন নাপিত, একজন মুচি আর একজন মুসলমান

তীর্থী। এই মুসলমান তীর্থী কবীর তাঁর শিষ্যদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত।



কবীর

মুসলমান এই দুই ধর্মের বহু মাল্লুষ তাঁর শিষ্য হয়। তিনি হিন্দী ভাষায় বহু ভক্তিমূলক গান বা দৌহা রচনা করেছেন।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ-ভাগে (১৪৮৫ খ্রীঃ) বঙ্গদেশের নবদ্বীপে আর এক ভক্তি ধর্মের প্রবর্তক জন্মগ্রহণ করেন। ইনিই শ্রীচৈতন্যদেব। তাঁর প্রচারিত ভক্তি-ধর্মকে গোড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম বলা হয়। চৈতন্যদেব অল্প বয়সে নানা শাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন।

২৪ বছর বয়সে সংসার

ছেড়ে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং গোড়, ওড়িশা, দাক্ষিণাত্য ও বৃন্দাবনে তাঁর ভক্তিবর্গ প্রচার করেন। ওড়িশার রাজা প্রতাপরুদ্রদেব



শ্রীচৈতন্য

শ্রীচৈতন্যের কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন। চৈতন্যদেব জাতিভেদ মানতেন না, সব জাতির মানুষ তাঁর শিষ্য হয়েছিল। তাঁর এক প্রধান শিষ্য

হরিদাস মুসলমান ছিলেন, তাই তিনি যখন হরিদাস শ্রীচৈতন্য

নামে পরিচিত হন। তাঁর মতে সমস্ত জীবকে ভালবাসা, হরিনামে রুচি আর ভগবানে প্রকৃত ভক্তি থাকলেই ঈশ্বরলাভ করা যায়। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলে বাঙালী জাতির ধর্ম-সংস্কৃতি, ভাষা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক নূতন যুগের সূত্রপাত হয়েছিল। বাংলা ও ওড়িশার ধর্মজীবনের ইতিহাসে শ্রীচৈতন্যের অবদানের তুলনা নেই।

চৈতন্যদেবের অল্প কিছুকাল আগে (১৪৬৯ খ্রীঃ) লাহোরের কাছে

ত.ল.মন্ডী গ্রামে

নানকের জন্ম হয়।

নানকের ধর্মমত

কবীরের ধর্মমতের

অনুরূপ। তিনি যে

ধর্ম প্রচার করেন

তাকে শিখধর্ম বলা

হয়। তাঁর ধর্মেরও

মূল কথা ঈশ্বর এক

এবং অদ্বিতীয়, তাই

হিন্দু-মুসলমান

কোন ভেদ নেই,

জাতিতে জাতিতে

নানক

পার্থক্য নেই। মূর্তিপূজা, ধর্মের বাহ্যিক অনুষ্ঠান প্রভৃতির তিনি প্রবল

বিরোধী ছিলেন। তিনি বলতেন যে ভালোবাসা

নানক

আর পবিত্রতা দ্বারাই ভগবানকে পাওয়া যায়। হিন্দু

ও মুসলমান এই দুই ধর্মের লোকই তাঁর শিষ্য হয়েছিল।

তুর্ক-আফগান যুগে ভারতে কয়েকজন মুসলমান সাধকের



আবির্ভাব হয়েছিল। এরা যে ধর্মমত প্রচার করেছিলেন তাকেই
সূর্য্যবাদ বলা হয়। এরাও ইসলাম ধর্মের বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান,
গোঁড়ামি ও পরমত-অসহিষ্ণুতার বিরোধী ছিলেন।
সূফীবাদ
তাদের মতের মূল কথা ছিল জীবে দয়া ও ঈশ্বরে
ভক্তি। সূফীবাদীদের ভেতর নিজামুদ্দীন আউলিয়া মইনুদ্দীন চিশ্তি,
শাহ জালাল এবং নূর-কুতুব-উল জালামের নাম সবচেয়ে বিখ্যাত।
হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের সমন্বয়ে এঁদের দান কম নয়।

হিন্দু ও মুসলমান সমাজে এই সব ধর্ম আন্দোলনের ফলে ভারতে
হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে প্রীতি ও একতার ভাব বৃদ্ধি পায়, সংকীর্ণতা
আর গোঁড়ামি কমে যায়। কথ্য ভাষায় এই সব ধর্ম প্রচারের ফলে
ভারতের আঞ্চলিক ভাষাগুলির সমৃদ্ধি বাড়ে, হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের
পথ প্রশস্ত হয়।

তিনশো বছরের সুলতানী শাসনের আমলে ভারতবাসীর অর্থ-
নৈতিক অবস্থা কি রকম ছিল তা সঠিক জানা
সুলতানী যুগের
অর্থনৈতিক অবস্থা
সম্ভব নয়। সমকালীন নানা রচনা ও বৈদেশিক
ভ্রমণকারীদের লেখা বিবরণ থেকে একটা মোটামুটি
ধারণা করা যায়। সে সময় ভারতের ধনসম্পদের খ্যাতি ছিল ছুনিয়া
জোড়া। কৃষিপণ্যের উৎপাদন এত বেশী হত যে পারস্য উপসাগরের
তীরবর্তী বহু দেশ ভারত থেকে খাদ্যশস্য আমদানীর উপর পুরাপুরি
নির্ভরশীল ছিল। গ্রামীণ কুটীরশিল্প শিল্পী-সংঘের অর্থবিচালনায় প্রচুর
শিল্পজাত দ্রব্য উৎপন্ন করতো এবং এই উৎপন্নের এক বড় অংশ
বিদেশে রপ্তানী হত। রেশম ও সূতীবস্ত্র-শিল্প, কাপড় রং করা
এং কাপড় ছাপার শিল্প, চিনি শিল্প, ধাতুশিল্প, কাগজ-শিল্প, গন্ধদ্রব্য,
কোহল ও মদ উৎপাদন শিল্প, অস্ত্র নির্মাণ-শিল্প প্রভৃতি ছিল ভারতের
প্রধান প্রধান শিল্প-সংগঠন। ভারত তখন স্থলপথে এবং জলপথে
বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্য করতো। জিনিসপত্রের—বিশেষ করে নিত্য
প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম সাধারণতঃ কম থাকলেও দুর্ভিক্ষের
সময় খুব বাড়তো, আবার অতি উৎপাদনের ফলে খুব কমতো।

ধনীদুরিদ্দের জীবনযাত্রার মানে বিরাট পার্থক্য ছিল। ধনীরা খুব বিলাস-প্রাচুর্যে দিন কাটালেও সাধারণ চাষীর জীবনযাত্রার মান খুব নীচু এবং করভারে জর্জরিত ছিল। তাই সে যুগের বিখ্যাত কবি আমীর খস্রু লিখেছেন, “সুলতানের মুকুটের প্রতিটি মুক্তা হিন্দুস্থানের দরিদ্র কৃষকের চোখের জলে তৈরি।” কাজেই মনে হয় যে মধ্যযুগীয় ভারতীয় কৃষক আজকের গরীব চাষীর চেয়ে বড় বেশি সুখে ছিল না।

দিল্লীর সুলতানরা ছিলেন সৈরাচারী শাসক। একমাত্র সামরিক শক্তির জোরে ‘বিধর্মীদের দেশ’ হিন্দুস্থানে শাসন অব্যাহত রাখতে হয়েছিল বলেই সমস্ত ক্ষমতা সুলতানের হাতেই কেন্দ্রীভূত থাকতো। সুলতানরা সৈরাচারী হলেও রাজ্যের শাসনকার্য এককভাবে পরিচালনা করা তাঁদের পক্ষে অবশ্যই সম্ভব ছিল না। তাই দিল্লীর সুলতানরা প্রথম থেকেই নানা বিভাগে শাসনব্যবস্থাকে ভাগ করে এক আমলাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন। এই সব বিভাগীয় কর্তারা সম্রাটের নির্দেশ অনুসারেই শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। সুলতানদের পরামর্শদাতা হিসেবে একটি পরিষদ ছিল, এই পরিষদ শাসনব্যবস্থা

বিশুদ্ধ কর্মচারী ও হিন্দুস্থানের বহুদলের নিয়ে গঠিত হত। বিচারকার্য পরিচালনা করতেন প্রধান কাজী বা **কাজা-উল কাজাভ**। তাঁকে সাহায্য করতেন **মুফতিয়া**। কোরানের বিধি-বিধান অনুযায়ী বিচারকার্য পরিচালিত হত। দূরবর্তী অঞ্চল-গুলোর শাসনকার্য পরিচালনার জন্তু নায়েব-সুলতান নামে একজন করে শাসনকর্তা নিযুক্ত হত, অঞ্চলগুলোকে ছোট ছোট ভাগে ভাগ করা হত এবং এই সব অংশের শাসনকার্য পরিচালনার জন্তু **আমিল** নামে এক শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগ করা হত। গ্রামগুলোর শাসন-ব্যবস্থায় তুর্ক-আফগান সুলতানরা কোনরকম পরিবর্তন করেন নি। সেগুলোতে প্রাচীন ভারতের ‘গ্রাম পঞ্চায়েত’ ব্যবস্থা অপরিবর্তিত ছিল।

দিল্লীর তুর্ক-আফগান শাসকরা বঙ্গদেশে তাঁদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করলেও মাত্র শতাব্দীকাল পরেই বঙ্গদেশে স্বাধীন রাজত্ব গড়ে ওঠে।

পরবর্তী দুই শতাব্দীকাল বা তারও কিছু বেশি সময় ধরে বঙ্গদেশ

তার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রেখেছিল। বঙ্গদেশের
বঙ্গদেশ: সামাজিক, স্বাধীন শাসকের মধ্যে ইলিয়াসশাহী ও হুসেন
সাংস্কৃতিক ও অর্থ-
নৈতিক অবস্থা শাহী বংশ প্রধান। দীর্ঘকাল স্বাধীন ও সুশৃঙ্খল

শাসনব্যবস্থার অধীন থাকায় বঙ্গের সামাজিক,
সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার ব্যাপক উন্নতি হয়। দিল্লীর
সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে স্বাধীন রাজ্য হিসেবে টিকে থাকবার জন্যই
বাংলার সুলতানেরা ধর্মের ক্ষেত্রে উদার মনোভাব গ্রহণ করেন এবং
শাসনকার্যে দক্ষ হিন্দুদের উচ্চপদে নিয়োগ করেন। এর ফলে
বাংলার সমাজ জীবনে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায়।

বাংলার সংস্কৃতিজীবনে স্বাধীন সুলতানী শাসনের গুরুত্ব খুব বেশি।
প্রধানতঃ মুসলমান সুলতানদের উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতাতেই বাংলা
ভাষা ও সাহিত্যের দ্রুত উন্নতি হয়। স্বাধীন বাংলাতেই রামায়ণ,
মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি সংস্কৃত সাহিত্যের অনুবাদচর্চা আরম্ভ হয়,
চৈতন্যদেবের প্রভাবে বৈষ্ণব পদাবলীকাব্যের রচনা ও অনুশীলন
উৎসাহিত হয়, মুসলমান কবি আলাওল বঙ্গভাষায় কাব্যরচনা করেন।
শিল্প-স্থাপত্যের ক্ষেত্রেও ভারতীয়, বাঙালী ও পারসীক শিল্পরীতির
মিলনে এক নূতন শিল্প স্থাপত্যের উদ্ভব হয়। এইসব শিল্পরীতির
পরিচয় মেলে আদিমা মসজিদ, বড় সোনা মসজিদ, ফকর মসজিদ
প্রভৃতির স্থাপত্যরীতিতে।

বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা সে যুগে খুব উন্নত ছিল। বাংলার
সকল স্বাধীন সুলতানই নিজ শাসনকালে স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন করেন।
বাংলা সে সময় বৈদেশিক বাণিজ্যেও খুব অগ্রণী ছিল। সুতী ও
রেশমবস্ত্র, চিনি, খাত্তশস্ত্র প্রভৃতি বঙ্গদেশ থেকে জলপথে এবং স্থলপথে
বিদেশে রপ্তানী হত। সে সময়কার প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল সপ্তগ্রাম।
এই বন্দর থেকেই বাণিজ্য জাহাজ বাংলার পণ্য নিয়ে মালয় উপদ্বীপ,
চীন, পারস্য উপসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলে যেত। বঙ্গদেশে সে সময়
খাত্তসামগ্রী খুব সস্তা ছিল। ফলে দেশের মানুষের জীবনযাত্রা

ছিল অনায়াস এবং মোটামুটি সুখী। ইবন বতুতার রচনায়, বঙ্গদেশে আগত চীনা রাষ্ট্রদূতের লেখায় বাংলায় নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির প্রাচুর্যের উল্লেখ আছে।

কিন্তু সে কালের বাংলায় টাকাকড়ির প্রচলন কম ছিল বলেও সমকালীন লেখকেরা উল্লেখ করেছেন। এজ্ঞে কেউ কেউ মনে করেন যে, দেশের সাধারণ কৃষিজীবী মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার মান তেমন উন্নত ছিল না।

অনুশীলনী

১। ঘুরের মুহম্মদ কোন্ জাতিগোষ্ঠীর লোক ছিলেন? কোন্ সময় তিনি ভারত আক্রমণ করেন? তাঁর ভারত অভিযানের লক্ষ্য কি ছিল?

২। দিল্লীর কোন্ তুর্কী সুলতানের বংশকে দাসবংশ বলা হয়? এরূপ নামকরণের কারণ কি?

৩। কোন্ সুলতান ভারতে বৃহত্তম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন?

৪। দিল্লীর কোন্ সুলতানকে 'নাগজা রাজা' বলা হয় এবং কেন?

৫। তুর্কী-আফগান সুলতানরা ভারত-জোড়া স্থায়ী সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে পারেন নি কেন?

৬। সুলতানী আমলে ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৭। 'ভক্তিবাদ' ও 'সুফীবাদ' কাকে বলে? এই দুই মতবাদের মূল কথা কি? কোথায়, কখন এবং কেন এই দুই মতবাদের আবির্ভাব ঘটেছিল?

৮। ভারতের 'ভক্তিবাদ' কে প্রথম প্রবর্তন করেন? ভক্তিবাদের প্রবর্তকদের ভেতর হুজন মহাপুরুষের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৯। বাংলার স্বাধীন সুলতানী আমলের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার বিবরণ সংক্ষেপে লেখ।

১০। বঙ্গদীর ভেতর থেকে সঠিক তারিখটি বেছে নাও :—

(ক) মুহম্মদ ঘুরী দিল্লী অধিকার করেন কোন্ খ্রীষ্টাব্দে? (১১৭৫/১১৯২)

(খ) কোন্ খ্রীষ্টাব্দে মুহম্মদ বিন-তুঘলক সিংহাসনে বসেন? (১২৫২/১৩২৫)

(গ) কোন্ খ্রীষ্টাব্দে বাবর দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন? (১৩২৬/১৫২৬)

(ঘ) কোন্ খ্রীষ্টাব্দে নানকের জন্ম হয়? (১৫৬১/১৫৬১)

(ঙ) চৈতন্যদেব কোন্ সময় জন্মগ্রহণ করেন? (১৩৮৫/১৪৮৫)

(চ) মুহম্মদ ঘুরীর মৃত্যু হয় কোন্ খ্রীষ্টাব্দে? (১২০৬/১৩০৬)

(ছ) কোন্ খ্রীষ্টাব্দে গিয়াসুদ্দীন মুহম্মদ গজনী অধিকার করেছিলেন?

(১১৭৩/১১৭৫)

ত্রয়োদশ অধ্যায়

মধ্যযুগের অবসানে

[সংক্ষিপ্তসার :—ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইউরোপে নবজাগৃতির সূত্রপাত হয় প্রাচীন গ্রীক-রোমান জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন-শিল্পকলার অল্পশীলন চেটার ভেতর দিয়ে, জ্ঞানচর্চার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ও সংস্কৃতিকে প্রচারা মধ্য দিয়ে কনস্টান্টিনোপলের পতনের ফলে প্রাচীন গ্রীক-রোমান সংস্কৃতির সঙ্গে । পশ্চিম ইউরোপের যোগাযোগ বন্ধি পেয়ে নবজাগৃতিকে ত্বরান্বিত করেছিল । এর ফলে নতুন জ্ঞানের প্রতি আগ্রহ, যুক্তিবাদের প্রতি আস্থা বাড়তে থাকে । বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, ভৌগোলিক আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে ইউরোপের মানব সমাজের জ্ঞানের পরিধি বাড়ে । চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীর ভেতর পশ্চিম ইউরোপ জুড়ে নতুন জাতীয়তাবোধের ধারণা বৃদ্ধি পায়, ফ্রান্স, ইংলণ্ড প্রভৃতি জাতীয় রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটে । জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি, জীবনযাত্রার মানের উন্নতি প্রভৃতির ফলে সামন্ত-সমাজবোধের সঙ্গে নতুন সমাজবোধের সংঘাত দেখা দেয় ।]

মানব-সভ্যতার মধ্যযুগ সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থাকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছিল । কিন্তু এর অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সামন্ত ব্যবস্থার বিরোধী পরিবেশ ক্রমাগত সৃষ্টি হতে থাকে । ইউরোপেই

এর লক্ষণগুলো প্রথম স্পষ্ট হয়ে ওঠে । জার্মানীর সামন্ততন্ত্রের অবসানের ইঙ্গিত

‘পবিত্র রোমান সম্রাট’-র বংশ সিংহাসনচ্যুত হলে জার্মানী কতকগুলো ছোট ছোট সামন্ত রাজাদের এক সম্মিলিত রাজ্যে পরিণত হয়ে দুর্বল হয়ে পড়ে । ইংলণ্ডের রাজ-বংশও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে একশো বছর ধরে লড়ে দুর্বল হয়ে পড়ে । সামন্ত জমিদারেরা হুঁদলে বিভক্ত হয়ে নিজেদের ভেতর লড়াই চালিয়ে শক্তিহীন হয়, নতুন রাজবংশ ইংলণ্ডের সিংহাসনে বসে । জোয়ান অব আর্ক-এর নেতৃত্বে ফ্রান্সের কৃষক-কারিগর-বণিক-মধ্যবিত্ত এক

নূতন জাতীয়তাবোধের প্রেরণায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে ইংরেজদের তাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়ে কেন্দ্রীয় রাজশক্তির ক্ষমতারুদ্ধিতে সাহায্য করে। ইংলণ্ডের কৃষক ও নিম্নবিত্ত শ্রেণী এই যুদ্ধের ভেতর দিয়ে নিজেদের সামরিক ক্ষমতায় আত্মবান হয়ে সামন্ত-ভূস্বামীদের প্রাধান্য দমন করে এবং বণিক ও বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্তের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে জাতীয়তাবোধে অনুপ্রাণিত হয়। ফলে ইংলণ্ডেও কেন্দ্রীয় রাজশক্তি ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতেই ইতালীতে বণিক-প্রধান স্বাধীন নগর-রাষ্ট্র ভেনিস, মিলান, নেপল্‌স, জেনোয়া, পিসা প্রভৃতি শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। ভেনিস, জেনোয়া আর নেপল্‌সের ব্যবসায়ী শ্রেণী বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টান্টিনোপলকে কেন্দ্র করে প্রাচ্যদেশের সঙ্গে বাণিজ্য করতো। বাণিজ্যিক ভেনিস বনাম জেনোয়া স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে ভেনিস আর জেনোয়ার ভেতর এই রেষারেষি খুব জোরদার হয়ে ওঠে।

বাইজান্টাইন সম্রাট জেনোয়ার বণিকদের বিশেষ বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা দেওয়ায় ভেনিসের সঙ্গে বাইজান্টিয়ামের বিরোধ শুরু হয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে। তাই যখন পোপ তৃতীয় ইনোসেন্ট ১২৮২ খ্রীষ্টাব্দে চতুর্থ ক্রুসেড-এর উদ্যোগ গ্রহণ করলেন তখন ভেনিসের বাণিক্য সম্প্রদায়কে দিয়ে বিশেষ করে ক্রুসেড-বাহিনীকে জাহাজ, রসদ, হাতিয়ার যোগান দিয়ে, বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে

প্ররোচিত করলো। বাইজান্টাইন সম্রাট তৃতীয় ঈর্থ ক্রুসেড : কনস্টান্টিনোপল অধিকার

প্ররোচিত করলো। বাইজান্টাইন সম্রাট তৃতীয় ঈর্থ ক্রুসেড : কনস্টান্টিনোপল অধিকার আলেক্সিয়াস-এর ভাইপো আলেক্সিয়াস ক্রুসেড-বাহিনীর নেতা সোয়াবিয়ার রাজা ফিলিপ আর মন্টফেরাত-এর সামন্ত-প্রধান বনিফিস-এর সমর্থন ও সহযোগিতা আদায় করলে চতুর্থ ক্রুসেড প্যালেস্টাইন উদ্ধারের পরিবর্তে কনস্টান্টিনোপল আক্রমণ ও অধিকার করে (১২০২ খ্রীঃ)। পশ্চিম ইউরোপের ক্রুসেড বাহিনীর বর্বর লুণ্ঠন ও ধ্বংসলীলায় 'প্রাচ্যের নূতন রোম' কনস্টান্টিনোপল বিধ্বস্ত হয়। ১২৬১

খ্রীষ্টাব্দে গ্রীক সম্রাটের কনস্টান্টিনোপল পুনরধিকার করলেও তার পূর্বগৌরব ফিরিয়ে আনতে আর পারেন নি।

ফলে, মাত্র দুশো বছরের ভেতরেই বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। অটোমান তুর্কী সুলতান দ্বিতীয় বাইজান্টাইন ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে একলক্ষ সৈন্য নিয়ে কনস্টান্টিনোপল অবরোধ করলে কনস্টান্টিনোপল তুর্কী বাহিনীর পদানত হয়।

বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের পতনের পর তুর্কী শাসনাধীন কনস্টান্টিনোপল থেকে, বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের অন্যান্য অঞ্চল থেকে যে সব গ্রীক পণ্ডিতেরা পশ্চিম ইউরোপে চলে আসতে থাকেন ইতালীর সমৃদ্ধ নগরগুলি তাঁদের সাগ্রহে আশ্রয় দিতে আরম্ভ করে।

গ্রীক পণ্ডিতেরা প্লেটোর শিক্ষায়তনের আদর্শ অনুসরণ করে ইতালীর নানা শহরে প্রাচীন গ্রীক শাস্ত্রাদি শিক্ষার বিদ্যালয় গড়ে তুলে প্রাচীন গ্রীক সংস্কৃতির অহুশীলনকে এগিয়ে দিতে আরম্ভ করেন। ক্রমে প্রাচীন গ্রীকরোমান সংস্কৃতিচর্চার সাধনা এক নূতন ভাবধারার জন্ম দেয়। এই ভাবধারা হল বাস্তব জগতের প্রতি, সাংসারিক সুখ-সম্ভোগের প্রতি আকর্ষণ, মানবিকতার প্রতি অনুরাগ আর খ্রীষ্টান ধর্মের নীতি-নির্দেশগুলোকে যুক্তির আলোকে বিচারের প্রবণতা। ইউরোপে নূতন যুগের আবির্ভাবের ভিত্তি তৈরি হল এই নূতন মানবিক মূল্যবোধের ভেতর দিয়ে। একদিকে এই মূল্যবোধ জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চার আগ্রহ আরও বাড়িয়ে দিল, সংসারজীবনকে সুন্দর আর সুখী করবার আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করল, অন্যদিকে অর্থনৈতিক উন্নতি-বিকাশের তাগিদে ব্যবসা-বাণিজ্যের অগ্রগতির প্রেরণা জাগিয়ে তুলল।

চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইতালীতে বিজ্ঞানচর্চার যে জোয়ার আসে তার ফলেই ইউরোপের পণ্ডিতেরা বিশ্বাস করতে শুরু করেন যে, পৃথিবীর আকার গোলাকার বলের মতো। পশ্চিম ইউরোপের নাবিকদের দুঃসাহসী অভিযান আটলান্টিক সমুদ্রের সঙ্গে তাঁদের

পরিচয় বৃদ্ধি করে, গণিত ও বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে সমুদ্রে জাহাজ চলাচলের জ্ঞান প্রয়োজনীয় কিছু কিছু যন্ত্রপাতির ভৌগোলিক আবিষ্কার সম্ভব হয়। ১৪৮৭ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগীজ আবিষ্কার : বাণিজ্য নাবিক বার্থেলেমিউ দিয়াজ সর্বপ্রথম আটলান্টিক ও উপনিবেশ সমুদ্রপথে আফ্রিকা মহাদেশ ঘুরে ভারত মহাসাগরে প্রবেশ করেন। ১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দে জেনোয়ার অধিবাসী ক্রিস্টোফার কলম্বাস স্পেনের জাহাজ ও স্পেনীয় নাবিকদের সাহায্যে আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিয়ে নূতন মহাদেশে উপস্থিত হলেন (যে মহাদেশ পরে অ্যামেরিগো ভেসপুচির নাম অনুসারে আমেরিকা নামে চিহ্নিত হয়)। ১৪৯৭-৯৮ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-ডা-গামা আফ্রিকা ঘুরে ভারতে আসবার পথ আবিষ্কার করেন। এইসব আবিষ্কারের ফলে একদিকে ইউরোপের মানুষের উপনিবেশ বিস্তার আরম্ভ হয়, অন্যদিকে প্রাচ্যদেশের সঙ্গে সরাসরি-বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে ইউরোপের, বিশেষ করে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলির অর্থ নৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক সমৃদ্ধির পথ খুলে যায়। ফলে উপনিবেশিক সম্প্রসারণের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। সমাজে বণিকশ্রেণীর প্রাধান্যের ভূমিকা রচিত হয়ে সামন্তযুগের অবসানের পথ কার দেয়।

শতাব্দীর শতাব্দীর সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিকাশ ইউরোপ জুড়ে নূতন নূতন জাতীয় রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে। ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতে ইংলণ্ড আর ফ্রান্স সর্বপ্রথম জাতীয় রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। শক্তিশালী জাতীয় রাষ্ট্র : ইংলণ্ড, ফ্রান্স, স্পেন পর্তুগাল স্বৈরাচারী রাজার শাসনাধীনে এই দুই দেশ সংগঠিত হয়ে ওঠে। আমেরিকা আবিষ্কারের ফলে স্পেন উপনিবেশিক সম্প্রসারণের সুবিধা পেয়ে আর্থিক ও সামরিক শক্তিতে বলশালী হয় এবং স্বৈরাচারী রাজ্যশাসন, পোপ ও রোমান ক্যাথলিক যাজক সম্প্রদায়ের সমর্থন সহযোগিতা স্পেনকে এক জাতীয় রাষ্ট্রে পরিণত করে। এর পশ্চিম পার্শ্ববর্তী পর্তুগালও আফ্রিকা-আমেরিকায় উপনিবেশ গড়ে, ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যপথ

আবিষ্কার করে ধনসম্পদে বলীয়ান জাতীয় রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

ফ্রান্সের উত্তর-পশ্চিমাংশ ফ্ল্যাণ্ডার্স স্পেনের অধিকারভুক্ত ছিল। এই অঞ্চল দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকেই পশম বয়ন শিল্পে উন্নত হয়ে ওঠে এবং এখানকার শিল্পী সংঘগুলি ও বণিকদের নেতৃত্বে গড়ে

জাতীয় রাষ্ট্র: ওঠা শিল্পনগরীগুলো সে সময়কার রাজশক্তির কাছ থেকে নানা সুযোগ-সুবিধা আদায় করে নেয়।

নেদারল্যান্ডস স্পেনের অধীনতায় এদের অধিকার বিলোপ করা হলে এদের মধ্যে বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ শুরু হয়, যার পরিণতিতে এখানেও স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্র নেদারল্যান্ডস-এর জন্ম হয় (১৫৯৮ খ্রীঃ)।

পশ্চিম ইউরোপের সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার আর এক প্রধান বৈশিষ্ট্য রোমান ক্যাথলিক গির্জা ও তার প্রধান পোপের রাজনৈতিক

প্রাচীন বনাম আধিপত্য। পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত সমস্ত ইউরোপীয় রাজশক্তিকে মোটামুটি এই প্রাধান্য স্বীকার করে

নবীন ব্যবস্থা: নিতে হয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নবজাগৃতি

ইংলণ্ডের বিদ্রোহ আন্দোলনের প্রভাবে জার্মানিতে মার্টিন লুথারের

নেতৃত্বে যে প্রবল ধর্মসংস্কার আন্দোলন শুরু হয়, তার ফলে ইউরোপের মূল ভূখণ্ডের মানুষদের মধ্যে ধর্মীয় সংঘাত জোমজোম হতে থাকে।

তাতেও ইউরোপের কোন রাজশক্তি পোপ বা ক্যাথলিক গির্জার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে সাহস পায়নি। কিন্তু ইংলণ্ডের বণিকশ্রেণীর

ঔপনিবেশিক সম্প্রসারণের এবং অর্থনৈতিক উন্নতির পথ রোমান ক্যাথলিক গির্জার প্রধান পোপের পক্ষপাত মূলক ব্যবহারে বন্ধ হয়ে

যাবার উপক্রম হওয়ায় ইংলণ্ডের জনমানসে রোমান ক্যাথলিক গির্জার মহিমা নষ্ট হয়ে যায়।

এই পরিস্থিতিতেই ইংলণ্ডের রাজা অষ্টম হেনরী পোপের কাছে তাঁর স্পেনবংশীয় স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদের যে আবেদন করেন তা

প্রত্যাখ্যাত হলে তিনি পার্লামেন্টের সমর্থনে ইংলণ্ডের গির্জাকে রোমের অধীনতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাজার পরিচালনাধীন 'চার্চ অব

ইংল্যান্ড'-এর সৃষ্টি করেন (১৫২৬ খ্রীঃ)। সামন্ত সমাজব্যবস্থার অন্ততম স্তম্ভ রোমান ক্যাথলিক গির্জার বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের এই রাষ্ট্রীয় বিদ্রোহ মধ্যযুগীয় সামন্তব্যবস্থার অবসানে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হয়ে ওঠে।

অনুশীলনী

১। মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার পতনের যে লক্ষণগুলো চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীতে দেখা দিয়েছিল তা সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

২। চতুর্দশ শতাব্দীতে কখন অস্থিতি হয়? এই ক্রুসেড কেন বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়? এর ফল কি হয়েছিল?

৩। রেনেসাঁ বা নবজাগৃতি কাকে বলে? ইতালীতে এর সূত্রপাত হয়েছিল কেন? ইউরোপের সমাজ-জীবনে এর প্রতিক্রিয়া কি হয়েছিল?

৪। ঊষোদয়-চতুর্দশ শতাব্দীতে ইউরোপে জাতীয় রাষ্ট্র গড়ে ওঠার কারণ কি? সামন্ত-সমাজব্যবস্থার উপর এর কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল?

৫। পঞ্চদশ শতাব্দীর ইউরোপে পুরোহীত আর নতুন সমাজব্যবস্থার সংঘর্ষ কোন্ ঘটনার মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছিল? এ প্রসঙ্গে ইংল্যান্ডের বিদ্রোহের তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

৬। দু' এক কথায় উত্তর দাও :—

(ক) কে চার্ট অব ইংলণ্ডের সৃষ্টি করেন? (খ) ফ্ল্যাণ্ডার্স-এর জাতীয় রাষ্ট্রের নাম কি? (গ) পঞ্চদশ শতাব্দীতে কাম নেতৃত্ব বহনকারী আলোনসো আরভাস (১৫) কে প্রথম আর্টলান্টিক মহাসাগর পথে আফ্রিকা ঘুরে ভারত মহাসাগরে প্রবেশ করেন? (ঙ) কোন্ খ্রীষ্টকে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের পতন হয়েছিল? (চ) 'শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধ' হয়েছিল কাদের মধ্যে? (ছ) কার উদ্যোগে ৪র্থ ক্রুসেড অস্থিতি হয়? (জ) 'প্রাচ্যের নতুন রোম' কোন্ শহরকে বলা হত?

৭। শূন্যস্থান পূর্ণ কর :—

(ক) — শতাব্দীতে ইউরোপে নবজাগৃতির সূচনা হয়।

(খ) ঊষোদয় শতাব্দীতে ভেনিসের সঙ্গে — বিরোধ শুরু হয়।

(গ) — খ্রীষ্টকে 'ইংলণ্ডের বিদ্রোহ' ঘটেছিল।

(ঘ) ক্রিস্টোফার কলম্বাস — অধিবাসী ছিলেন।

(ঙ) — এর নেতৃত্বে ফ্রান্সের কৃষক বারিগর-মধ্যবিত্ত ইংরেজদের পরাজিত করে।

পরিশিষ্ট

কালপঞ্জী

৩১৩ খ্রীঃ রোম সাম্রাজ্যের সামাজিক ও রাজনৈতিক সংকট।
 রোম সম্রাট কনস্ট্যানটাইন।
 মিলান বিধি,—রোম সাম্রাজ্যে খ্রীষ্টধর্মের বৈধতা স্বীকার।

৩৩০ ” রোম সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টান্টিনোপলে স্থানান্তর।

৩৩৭-৩৮০ ” পশ্চিম ইউরোপে হুণ অভিযান।

৩৯৫ ” রোম সাম্রাজ্য পূর্ব ও পশ্চিম সাম্রাজ্যে বিভাজন।

৪১০ ” ভিসিগথ নেতা এ্যলারিকের রোম লুণ্ঠন।

৪১৫ ” গলদেশে হুণ আক্রমণ পযুঁদস্ত।

৪৫৫ ” ভ্যাণ্ডাল উপজাতি কর্তৃক রোম লুণ্ঠন।

৪৭৬ ” পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের অবসান।

৫ম শতাব্দীর শেষভাগ ভারতে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন।

৫ম শতাব্দীর

শেষভাগ ভারতে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন।

৫৩৫-৫৫৫ খ্রীঃ বাইজান্টাইন সম্রাট জাস্টিনিয়ানের ইতালী জয়।

৫৬৬-৫৬৭ ” দক্ষিণ ভারতে চালুক্য বংশের রাজ্যপ্রতিষ্ঠা।

৫৬৯ ” চীনে ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা।

৬০৬ ” হর্ষবর্ধনের রাজত্বলাভ, উত্তর ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তার।

৬১৮ ” চীনে টাং রাজত্বের সূত্রপাত।

৬১৯-৬২০ ” পূর্বভারতে গৌড়রাজ শশাঙ্কের রাজ্যবিস্তার।

৬২২ ” হজরত মুহম্মদের মদিনা যাত্রা; হিজরী সনের আরম্ভ।

৬৩০-৩১ ” হুয়েন সাং-এর ভারত আগমন।

- ৬৪৫ খ্রীঃ জাপানে তাইকোয়া সংস্কার ।
- ৬৬৯ ” ইসলামের অভ্যুদয় : উম্মাইদ খলিফাদের শাসন ।
- ৭১১ ” স্পেনে মুসলমান অধিকার প্রতিষ্ঠা ।
- আঃ ৭৫০ ” বাংলায় পালবংশের অভ্যুদয় ।
আব্বাসী খলিফাদের শাসন ।
- ৮০০ ” সম্রাট শার্লমেন ও ‘পবিত্র’ রোমান সাম্রাজ্য ।
- ৯৬০ ” চীনে সুং রাজত্বের সূত্রপাত ।
- ১০৯৬ ” প্রথম ক্রসেড ।
- ১১৪৭ ” দ্বিতীয় ক্রসেড ।
- ১১৮৯ ” তৃতীয় ক্রসেড : ইউরোপের সামাজিক পরিবর্তন ।
- ১২০৪ ” শিক্ষার বিস্তার, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ।
- ১২০৪ ” চতুর্থ ক্রসেড ।
- ১২০৬ ” ভারতে তুর্কী শাসনের প্রতিষ্ঠা ।
- ১২৮০ ” চীনে য়ুয়ান যুগ. মোঙ্গল সাম্রাজ্যের চীন অধিকার ।
- ১৩৩৭-১৪৫৩ ” শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধ ।
- ১৪৫৩ ” কনস্টান্টিনোপলের পতন ; ইতালীর নবজাগৃতি ।
- ১৪৫৫-১৪৮৫ ” গোল্লাপের যুদ্ধ : নূতন যুগের অভ্যুদয়ের সূত্রপাত ।
- ১৪৯২ ” কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কার ।
- ১৪৯৭-১৪৯৮ ” ভাস্কো-ডা গামার ভারত আগমন ।
- ১৫১৭ ” জার্মানীতে ধর্মসংস্কার আন্দোলন ।
- ১৫১৯-১৫২২ ” ম্যাগেলানের পৃথিবী প্রদক্ষিণ ।
- ১৫২৯ ” ইংল্যান্ডের গির্জার পোপের অধীনতা অস্বীকার ।

পরিশিষ্ট-খ

[২৭ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দ হইতে ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত]

রোম সম্রাটদের তালিকা]

নাম	সিংহাসনে বসিবার বৎসর	নাম	সিংহাসনে বসিবার বৎসর
অগাস্টাস	২৭ খ্রীঃ পূঃ	এলাগাবেলাস	২১৮ খ্রীষ্টাব্দ
টিবেরিয়াস	১৪ খ্রীষ্টাব্দ	আলেকজান্দার সেভেরাস	২২২ "
ক্যালিগুলা	৩৭ "	ম্যাক্সিমিন	২৩৫ "
নীরো	৪১ "	তুইজেন গর্ডিয়ান, ম্যাক্সিমাস পুণিয়েনাস বালবিনাস	} ২৩৭ "
গলবা, ওথো, ভিটেলিয়াস, ভেস্পাসিয়ান	} ৬৮ "	গর্ডিয়ান (৩য়)	
টিটাস	৭৯ "	ফিলিপ	২৪৪ "
ডোমিটিয়ান	৮১ "	দিমিয়ান	২৪৮ "
নার্সা	৯৬ "	হোসটিলিয়ান	} ২৫১ "
ট্রাজান	৯৮ "	প্যাবাস	
হার্ডিয়ান	১১৭ "	ভলুসিয়ান	২৫২ "
এ্যাণ্টোনিয়ান পায়াস	১৩৮ "	এমিলিয়ান, ভ্যালেরিয়ান, প্যালিয়েনাস	} ২৫৩ "
মার্কাস অরেলিয়ান	১৬১ "	কুডিয়ান (২য়)	
কমোডাস	১৮০ "	অরেলিয়ান	২৭০ "
পার্টিনাক্স	১৯৩ "	ট্যানিটাস	২৭৫ "
দিদিয়ান জুলিয়ানাস	১৯৩ "	ফ্লোরিয়ান	২৭৬ "
নাইজার	১৯৩ "	প্রোবাস	২৭৬ "
সেপ্টিমাস সেভেরাস	১৯৩ "	ক্যারাস	২৮২ "
কারাকাল্লা, পেটা, ওপিলিয়ান ম্যাক্রিনাস ডায়াদুমেনিয়ান	} ২১৭ "	ক্যারিনাস, অুমেরিয়ান	} ২৮৪ "

খ (২)

নাম	সিংহাসনে বসিবার বৎসর	নাম	সিংহাসনে বসিবার বৎসর
ডায়োক্রিটিয়ান	২৮৪ খ্রীষ্টাব্দ	ভ্যালেন্স ও	
ম্যাক্সিমিয়ান ও ডায়োক্রিটিয়ান	২৮৬ "	১ম ভ্যালেন্টিনিয়ান	৩৭৫ খ্রীষ্টাব্দ
কনস্ট্যান্টিয়াস, গ্যালেরিয়াস	৩০৫ "	গ্রাজিয়ান ও ১ম ভ্যালেন্টিয়ান	৩৬৭ "
সেভেরাস	৩০৬ "	গ্রাজিয়ান ও ২য় ভ্যালেন্টিয়ান	৩৭৫ "
কনস্ট্যানটাইন	৩০৬ "	থিওডোসিয়াস	৩৭৯ "
লিসিনিয়াস	৩০৭ "	হনোরিয়াস	৩৯৫ "
ম্যাক্সিমিন	৩০৮ "	ভ্যালেন্টিনিয়ান (৩য়)	৪২৪ "
কনস্ট্যানটাইন, গ্যালেরিয়াস, লিসিনিাস, ম্যাক্সিমিন, ম্যাক্সেনিয়াস ও ম্যাক্সিমিয়ানের মুক্ত শাসন	৩১২ "	ম্যাক্সিমাস, অভিটাস	৪৫৫ "
কনস্ট্যানটাইন (একাকী)	৩২৩ "	ম্যাক্সোরিয়ান	৪৫৫ "
কনস্ট্যান্টিন (২য়), ভ্যালেন্টিয়াস (২য়), কনস্ট্যান্টিন ম্যাক্সেনিয়াস	৩২৪ "	সেভেরাস	৪৬১ "
কনস্ট্যান্টিয়াস (একাকী)	৩৫৩ "	ভ্যাকেন্স	৪৬৫ "
জুলিয়ান	৩৬১ "	ভ্যাকেন্স	৪৬৭ "
জোভিয়ান	৩৬৩ "	এ্যান্থেমিয়াস মালিয়াস	৪৭২ "
		গ্রাইকোরিয়াস	৪৭৩ "
		জুলিয়াস নেপোস	৪৭৪ "
		রোমুলাস অগস্তাস	৪৭৫ "

খ (৩)

ক্যারোলিঙ্গ বংশ তালিকা

পিপ্লিন (১ম) [অক্টেসিয়ার মেয়র]

|

বেগ্‌গা (কন্ডা)

|

পিপ্লিন (২য়)—দৌহিত্র

[অক্টেসিয়ার, নিউষ্ট্রিয়ার ও ব্যাভেরিয়ার মেয়র]

|

চার্লস মার্টেল

[সমস্ত ফ্রাঙ্ক রাজ্যের মেয়র]

|

পিপ্লিন (৩য়)

[ফ্রাঙ্ক রাজ্যের রাজা : ৭৫২-৭৬৮ খ্রিঃ]

|

শার্লোমেয় (চার্লস)

[ফ্রাঙ্ক রাজ্যের রাজা : 'পবিত্র রোম সাম্রাজ্যের সম্রাট'—৭৬৮-৮১৪ খ্রিঃ]

|

লুই (লো দেবোনেয়ার)

L. - - - - - ১

|

চার্লস (দি বল্ড)

[আধুনিক ফ্রাঙ্ক
অঞ্চলের সম্রাট—
৮৪০ খ্রিঃ]

লুই (দি জার্মান)

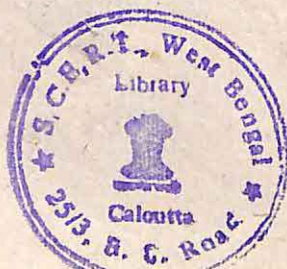
[আধুনিক জার্মানী অঞ্চলের
সম্রাট—৮৪০ খ্রিঃ]

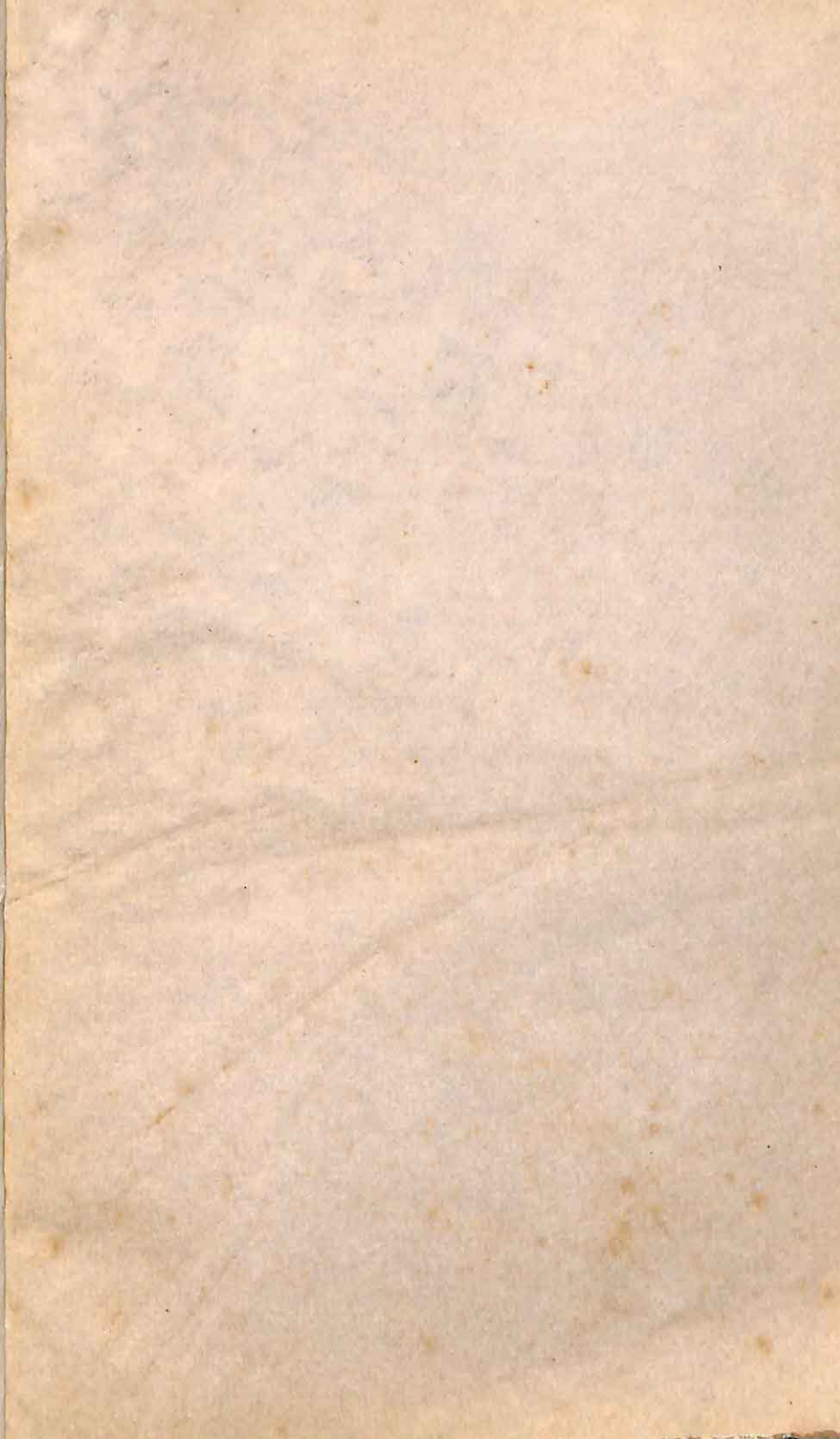
|

চার্লস (দি ফাট)

['পবিত্র রোমান সম্রাট' ৮৮০-৮৭ খ্রিঃ]

লোথোয়ার

[বার্গাণ্ডি ইতালী
অঞ্চলের সম্রাট—
৮৪০ খ্রিঃ]



H 11
BIN